KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No.: KLMLGK 2007	Place of Publication ৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কল-১৩
Collection: KLMLGK	Publisher মীর্জা ওসমান
Title চতুরঙ্গ	Size 7"x 9.5" 17.78 X 24.13 c.m.
Vol. & Number ৪৭/১ ৪৭/২ ৪৭/৩ ৪৭/৪ ৪৭/৫	Year of Publication May 1986 Jun 1986 July 1986 Sep 1986 Oct 1986
	Condition: Brittle / Good ✓
Editor: আবদুর রউফ	Remarks:

C.D. Roll No. KLMLGK

হুমায়ুন কবির এবং আতাউর রহমান-প্রতিষ্ঠিত

চতুরঙ্গ

১৯৮৬ • জুলাই

বন্ধন-ছেদন ভারতবর্ষের এ-প্রান্তে ও-প্রান্তে বিচ্ছিন্নতাবাদের যে ঢেউ ফুঁসে-ফুঁসে উঠছে, বর্তমান সাংবিধানিক কাঠামোর মধ্যে তার প্রশমন কি সম্ভব? না-কি প্রয়োজন সম্পূর্ণ অন্য প্রকৃতির সাংবিধানিক কাঠামো—যার দ্বারা ভিন্ন-ভিন্ন জাতি-উপজাতির ন্যায্য আশা-আকাঙ্ক্ষার রূপায়ন সম্ভব? এই প্রশ্ন উত্থাপন করে তার বিশ্লেষণ করেছেন ড. পার্থ চট্টোপাধ্যায়।

ওষুধ-নীতি কার স্বার্থে? দীর্ঘপ্রতীক্ষিত জাতীয় ওষুধ-নীতি প্রচলিত হতে চলেছে কার স্বার্থে? —দরিদ্রজনসাধারণের, না-কি বহুজাতিক ওষুধ-সংস্থাগুলির? এই প্রশ্নেই ড. পীযূষকান্তি সরকারের বহুতথ্যসমৃদ্ধ আলোচনা।

রবীন্দ্রনাথের পরিকল্পিত বৈজ্ঞানিক ব্যাকরণ কবির পরিকল্পনার সার্থকতা, আজ তার বাস্তবায়নের পথে সমস্যাগুলি কী কী, কিভাবে তাদের সমাধান হতে পারে—এইসব প্রশ্নের আলোচনা করেছেন বাংলাদেশের ভাষাতাত্ত্বিক মনসুর মুসা।

বাঙালির সংস্কৃতির অভিমান কতখানি লোকদেখানো আর কতখানি আন্তরিক? বাংলাদেশের বিশিষ্ট সাহিত্যিক বশীর আল হেলালের আলোচনা—'সংস্কৃতির মন্দ দিক'।

স্পেনীয় নাট্যকার লোরকার সাম্প্রতিক পুনর্মূল্যায়ন-প্রচেষ্টার সঙ্গে সংগতি রেখে তাঁর তিনটি ট্র্যাজেডির আলোচনা করেছেন জীবনকুমার মুখোপাধ্যায়।

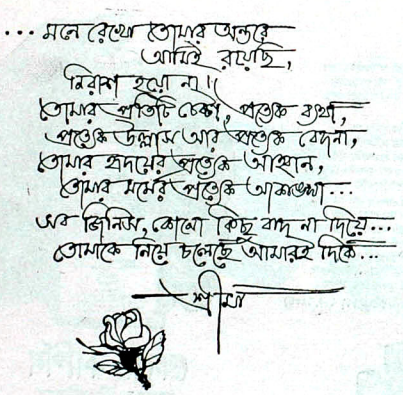

বর্ষ ৪৭। সংখ্যা ৩
জুলাই ১৯৮৬
আষাঢ় ১৩৯৩

বন্ধন-ছেদন পার্থ চট্টোপাধ্যায় ১৬১
রবীন্দ্রনাথের বৈজ্ঞানিক ব্যাকরণের ধারণা মনসুর মুসা ১৭৩
জাতীয় ওষুধ-নীতি কার স্বার্থে? পীযূষকান্তি সরকার ১৯১

খসে পড়ে বিষাদী-পালক মতি মুখোপাধ্যায় ১৬৯
জারুলের ধ্বনি মঞ্জুভাষ মিত্র ১৭০
হার্জ পাহাড়ে ফাউস্ট আনন্দ ঘোষ হাজরা ১৭১
অন্য অনন্তের জন্য সোফিওর রহমান ১৭২

অন্ধকার সমুদ্রের ঢেউ অজিত মুখোপাধ্যায় ১৭৯
অলীক মানুষ সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ ২০১

গ্রন্থসমালোচনা ২১২
শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়, মঞ্জুষ দাশগুপ্ত

বিশ্বসাহিত্য ২১৭
লোরকা : জীবনকুমার মুখোপাধ্যায়

বাংলাদেশ থেকে ২২৩
সংস্কৃতির মন্দ দিক : বশীর আলহেলাল

প্রতিবেদন ২২৯
গ্রামীণ মুসলিম সমাজ : রফিউদ্দিন

আলোচনা ২৩৫
ভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

মতামত ২৩৩
অশোক ঘোষ

শিল্পপরিকল্পনা। রনেনআয়ন দত্ত
নির্বাহী সম্পাদক। আবদুর রউফ

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

শ্রীমতী নীরা রহমান কর্তৃক রামকৃষ্ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৪৪ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলিকাতা-৯ থেকে
অন্তরঙ্গ প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে মুদ্রিত ও ৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ,
কলিকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত ও সম্পাদিত। ফোন : ২৭-৬৩২৭

বাংলা বই-এর খবর—৫

বাংলা প্রকাশন জগতের প্রবাদপুরুষ
শ্রীঅরবিন্দের আশীর্বাদধন্য
ও
গত ছয় দশকের বাঙালী লেখকদের
একান্ত সুহৃদ 'গোপালদা'
গোপালদাস মজুমদারের
আত্মস্মৃতি
স্মরণ-বরণ
'স্মরণ বরণ' আমাদের স্বাধীনতাসংগ্রাম
ও সাহিত্যজগতের এক অসাধারণ দলিল।
দাম—১৬ টাকা

ডি. এম. লাইব্রেরী / ৪২ বিধান সরণী / কলকাতা-৭০০ ০০৬
পোস্ট বক্স নং-১১৪৫৩ / ফোন ৩৪১০৬৬

বন্ধন-ছেদন

পার্থ চট্টোপাধ্যায়

১

সম্প্রতি বিচ্ছিন্নতার সমস্যা নিয়ে খুব একটা শোরগোল পড়ে গেছে। দেশ টুকরো-টুকরো হয়ে যাচ্ছে, সবাই পরস্পর ঝগড়া করছে, সন্দেহ করছে, কেউ কারো সঙ্গে মিলেমিশে থাকতে পারছে না। চতুর্দিকে একটা 'গেল-গেল' রব। কেউ দোষ দিচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকারকে, কেউ প্রধানমন্ত্রী আর তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গদের, কেউ রাজ্য সরকারগুলোকে, রাজনৈতিক দলগুলোকে, কেউ আবার সংখ্যালঘুদের। আবার অনেকে বলছে, আমাদের জাতীয় চরিত্রটাই নাকি তৈরি হয় নি—আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি একান্তই সংকীর্ণ, নিজের ঘরবাড়ি আত্মীয়-স্বজন—এর বেশি আর কিছু আমরা দেখতে পাই না। নিজের কাজ ঠিক করে করি না, স্বজনপোষণ করি, ঘুষ নিই ইত্যাদি ইত্যাদি। সুস্থ, স্থায়ী, শক্তিশালী আধুনিক রাষ্ট্র গড়ে তোলার ক্ষমতাই আমাদের নেই।

যতদিন মনে পড়ে, অর্থাৎ গত ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছর ধরে এরকম একটা কথা মাঝে-মাঝেই শুনে আসছি। স্বাধীনতা, দেশবিভাগের সময় আমার জ্ঞান হয় নি। ১৯৫০-৫১ থেকে ১৯৬৪-৬৫ সাল পর্যন্ত কলকাতা এবং আশেপাশে মাঝে-মাঝেই হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা হত, মনে আছে। সে সময় বড়োদের কথাবার্তা শুনে মনে হত, ভারতবর্ষের বুকে হিন্দু-মুসলমান একত্রে মিলেমিশে বাস করা কস্মিনকালেও সম্ভব হবে না। ১৯৬২ সালে চীনের সঙ্গে, ১৯৬৫ সালে পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ বেশ মনে আছে। শুনতাম, দেশের সামনে এক বিরাট সংকট, বিশ্ব জুড়ে চক্রান্ত চলেছে ভারতবর্ষকে টুকরো-টুকরো করে ফেলার। নিজেও বোধহয় সেইরকমই বিশ্বাস করতাম। তারপর থেকে কংগ্রেস-ভাগ, বাংলাদেশ যুদ্ধ, এমারজেনসি, জনতা সরকারের উত্থান ও পতন, ইন্দিরার প্রত্যাবর্তন—এসব তো একালেরই ইতিহাস। খুঁজে দেখলে এমন একটা সময়ও বের করা যাবে না যখন 'গেল-গেল' বলে আর্তনাদ করার কোনো-না-কোনো কারণ ছিল না। তাহলে আজকের সংকটের বিশেষত্ব কোথায়? এদেশের রাজনৈতিক অবস্থা তো চিরকালই সংকটাপন্ন। তারই মধ্যে কোনোরকমে হোঁচট খেতে-খেতে আমরা এতদূর এগিয়ে এসেছি। আজও তাহলে সেইভাবেই এগিয়ে যাব! অত হা-হুতাশ করার কী আছে?

পার্থ চট্টোপাধ্যায় : 'Arms, Alliances and Stability' (১৯৭৫), 'Bengal 1920-1947 : The Land Question' (১৯৮২), এবং 'Nationalist Thought and the Colonial World' (১৯৮৬) গ্রন্থের রচয়িতা। বর্তমানে কলকাতার সেন্টার ফর স্টাডিজ ইন সোশ্যাল সায়েন্সেসে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক।

সত্যি কি তাই? আজ আমাদের রাষ্ট্রব্যবস্থা যেখানে এসে দাঁড়িয়েছে, তাতে আরো গভীর কোনো সংকটের চিহ্ন কি দেখা যাচ্ছে না? এতদিন ধরে যেভাবে গোঁজামিল দিতে-দিতে চালিয়ে এসেছি, অত্যাধুনিক বাঙলা ভাষায় যাকে আমরা বলি 'ম্যানেজ দেওয়া', তার সুযোগটুকুও কি ফুরিয়ে আসছে না? কথাটা ভেবে দেখার মতো, কারণ একটা দুশ্চিন্তা যেন লক্ষ করা যাচ্ছে।

২

'ম্যানেজ দেওয়া'-র ব্যাপারটাই আগে ধরা যাক। এক অর্থে রাষ্ট্র পরিচালনা মানেই 'ম্যানেজ দেওয়া'। সমাজের সব শ্রেণীর, সব স্তরের, সব গোষ্ঠীর মানুষের স্বার্থ এক নয়। শুধু যে এক নয় তাই নয়, অনেক সময়ই তা পরস্পরবিরোধী। ফলে মতবিরোধ, সংঘাত অবশ্যম্ভাবী। মতবিরোধ বা কলহ যে-কোনো মনুষ্য-সমাজেই থাকতে পারে। সব সমাজে কিন্তু তাই বলে রাষ্ট্র থাকে না। বনজঙ্গল নদীনালা থেকে খাদ্য আহরণ করে কিংবা গোরু-ভেড়া-ছাগল চরিয়ে বেঁচে থাকে—এমন বহু ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর কথা ইতিহাস আর নৃতত্ত্বের বইয়ে পাওয়া যায়। পৃথিবীর নানা অঞ্চলে এই তথাকথিত 'আদিম' মানুষেরা আজও টিঁকে আছে। এদের সমাজজীবনে রাষ্ট্র বলে কোনো ব্যবস্থার চিহ্নমাত্র নেই। তাদের সমাজে ঝগড়াঝাঁটি হয় না এমন নয়। জীবনধারণের প্রয়োজনে আপাতবিচ্ছিন্ন নানা জনগোষ্ঠীর মধ্যে সহযোগিতার দরকার হয় না, এমনও নয়। কিন্তু সমাজের নিয়মনীতি সেখানে রাজার হুকুমে তৈরি হয় না, রাষ্ট্রীয় আইনকানুন বলে সেখানে কিছু নেই। তাদের সমাজের নিয়ম কী করে তৈরি হয় এবং রক্ষিত হয়, তার অনেক বিস্ময়কর বিবরণ নৃতাত্ত্বিকদের আলোচনায় পাওয়া যায়। বৈবাহিক-পারিবারিক সম্পর্ক এবং ধর্মাচরণ আর ধর্মবিশ্বাসের নানা জটিল রীতিনীতির মধ্য দিয়ে তাদের সামাজিক নিয়ম এবং গোষ্ঠীগত সহযোগিতার ভিত প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই সামাজিক বন্ধন মোটেই রাষ্ট্রীয় ঐক্য বা সার্বভৌমত্বের ওপর নির্ভরশীল নয়।

উৎপাদনব্যবস্থার অগ্রগতি, বিশেষ করে নিয়মিত কৃষিকাজ ও স্থায়ী গ্রামবসতির পত্তন হওয়ার পর থেকেই সাধারণত সমাজজীবনে নির্দিষ্ট শ্রেণীভেদ দেখা দেয়। সামাজিক উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে এমন এক শ্রেণীর উদ্ভব সম্ভব হয়ে ওঠে যারা উৎপাদনের কাজে সরাসরি যুক্ত হয় না। অপরের উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রীর একাংশ আহরণ করেই তারা জীবনধারণ করতে পারে। শ্রেণীবিভক্ত সমাজের কাঠামো, তার উৎপাদনপ্রক্রিয়া, বিভিন্ন শ্রেণী আর গোষ্ঠীর মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক, তাদের আচার-অনুষ্ঠান, ধর্মবিশ্বাস—এ সবই 'আদিম' সমাজের তুলনায় অনেক বেশি জটিল, নানা সূক্ষ্ম স্তরে বিন্যস্ত। এই স্তরবিন্যাসের মূলে রয়েছে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের মধ্যে ক্ষমতার সম্পর্ক, অর্থাৎ প্রভুত্ব-অধীনতার সম্পর্ক। এই প্রভুত্ব-অধীনতার সম্পর্কেরই একটা বিশেষ প্রাতিষ্ঠানিক চেহারা পাওয়া যায় রাষ্ট্রব্যবস্থার মধ্যে।

মূলত ক্ষমতাশালী অর্থাৎ উদ্বৃত্তভোগী শ্রেণীর উদ্বৃত্ত আহরণের প্রক্রিয়া অক্ষুণ্ণ রাখা এবং প্রসারিত করার ব্যবস্থা হিসেবেই রাষ্ট্রের জন্ম। এজন্যই রাষ্ট্রের আইনকানুন, প্রশাসন, বিচারালয়, জেলখানা, পাইক বরকন্দাজ, পুলিস-মিলিটারি। সামাজিক ক্ষমতার নির্দিষ্ট আইনানুগ প্রয়োগের মাধ্যম হল রাষ্ট্রব্যবস্থা। কিন্তু শ্রেণীবিভক্ত সমাজে প্রভুত্বের অধিকারী শ্রেণীর সঙ্গে পদানত শ্রেণীর সম্পর্ক যেখানে এতটাই এক-পেশে, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা যেখানে ব্যবহৃত হয় সেই প্রভুত্ব-শালী শ্রেণীর শাসন বজায় রাখার জন্য, সেখানে রাষ্ট্রীয় ঐক্য বলতে কী বোঝায়? সমাজের সব মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করতে পারে এমন কোনো সামাজিক বন্ধন সেখানে আদৌ থাকতে পারে কি?

এই প্রশ্নের একটা উত্তর পাওয়া যায় ইওরোপের

রাষ্ট্রতত্ত্বে। মধ্যযুগের ইওরোপের রাজনৈতিক কাঠামো ছিল সামন্ততান্ত্রিক। সামন্তপ্রভুরা যে যার নিজের-নিজের জমিদারির ওপর বজায় রাখত ব্যক্তিগত সার্বভৌমত্বের অধিকার। জমিদারি এলাকার মধ্যে কৃষিকাজে নিযুক্ত ভূমিদাসেরা ছিল ব্যক্তিগতভাবে সামন্তপ্রভুর অধীন, অর্থাৎ প্রজা। জমির ব্যবহার, খাজনার পরিমাণ, প্রভু-ভৃত্যসম্পর্কের নানা দায়-দায়িত্ব—এ ব্যাপারে সামন্তপ্রভুরা সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাচার চালাত, এমন নিশ্চয় নয়। দ্বন্দ্ব-সংঘাত, বিদ্রোহ-বিদ্রোহদমন, আপসমীমাংসা ইত্যাদি নানা ঘটনার মধ্যে দিয়ে সব এলাকাতেই কিছু-কিছু রীতিনীতি বা প্রথা তৈরি হত যা কোনোপক্ষই চট করে অমান্য করত না। কিন্তু আইনের দিক দিয়ে এবং আদর্শের দিক দিয়ে জমিদারির ওপর সামন্তপ্রভুর ব্যক্তিগত সার্বভৌমত্ব ছিল অবিসংবাদিত।

বিভিন্ন স্তরের সামন্তপ্রভুদের শীর্ষে থাকত রাজা। রাজ্যের একতার ভিত্তি ছিল রাজার কাছে সামন্ত-প্রভুদের বশ্যতাস্বীকার। রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের অর্থ সামন্তপ্রভুদের বশে রাখতে পারা। এহেন মধ্যযুগীয় রাষ্ট্রব্যবস্থার আদর্শগত এবং বাস্তব ভিত্তি সম্পূর্ণ বদলে গেল সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীর সমাজবিপ্লব তথা রাষ্ট্রবিপ্লবের ফলে। প্রভু-ভূমিদাসের সম্পর্ক অস্বীকৃত হল, সামন্তপ্রভুর ব্যক্তিগত সার্বভৌমত্ব পরিবর্তিত হয়ে দাঁড়াল ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে। সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে অধীনতা রইল না এমন নয়, কিন্তু অধীনতার ভিত্তি হিসেবে স্বীকৃত হল বশ্যতা নয়—চুক্তি। যারা ছিল প্রজা, তারা হল নাগরিক। কোনো-কোনো দেশে রাজা রইল বটে, কিন্তু রাষ্ট্রের ঐক্য এবং সার্বভৌমত্বের প্রতীক হিসেবে, ব্যক্তিগত অধিকারের জোরে নয়। আর যেখানে রাষ্ট্রবিপ্লবের তোড়ে রাজকীয় শাসন সম্পূর্ণ উঠে গেল, সেখানে এল রিপাবলিক বা 'প্রজাতন্ত্র'। (আসলে 'রিপাবলিক'-এর অনুবাদ হিসেবে 'প্রজাতন্ত্র' শব্দটা মোটেই সুবিধের নয়। যেখানে প্রজাই নেই, সেখানে প্রজা-তন্ত্র আবার কী?) রাষ্ট্রের ঐক্য স্থাপিত হল রাজার সার্বভৌমত্বে নয়, রাষ্ট্রের নাগরিকদের সার্বভৌমত্বের এক নতুন গণতান্ত্রিক আদর্শে। বলা বাহুল্য, নবোদ্গত ধনতান্ত্রিক উৎপাদনব্যবস্থার সঙ্গে সংগতি রেখেই এই নতুন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার জন্ম।

আধুনিক রাষ্ট্রের এই আদর্শ ইওরোপীয় ইতিহাসের ফসল। রাষ্ট্রের অখণ্ডতা এখানে ভৌগোলিক সীমা-রেখা দিয়ে নির্দিষ্ট। অর্থাৎ একটা নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের ওপর রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব একক এবং প্রশ্নাতীত। সেই ভূখণ্ডের মধ্যে বসবাসকারী সকলেই রাষ্ট্রের নাগরিক এবং রাষ্ট্রের আইনকানুনের অধীন। যারা নাগরিক নয়, অর্থাৎ বিদেশী, তাদের আসাযাওয়া এবং কার্য-কলাপও রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধীন। পরিবর্তে রাষ্ট্রের অধি-নায়ক, মন্ত্রিপরিষদ, আইনপ্রণেতা ইত্যাদিদের নির্বাচন আর তাঁদের কাজকর্ম তদারকির ব্যাপারে নাগরিকদের রইল কিছু গণতান্ত্রিক অধিকার। রাষ্ট্রের ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যে নাগরিকদের ঐক্যবদ্ধ করে রাখল জাতীয়তাবোধ, অর্থাৎ একটা নির্দিষ্ট সাংস্কৃতিক আদর্শ যাতে সকলেই অংশীদার। জাতীয় সমাজে ভেদাভেদ থাকল নিশ্চয়, সংঘাত দ্বন্দ্ব সবই রইল, হয়তো বা নতুন চেহারা নিয়ে। সেইসব দ্বন্দ্বের সুষ্ঠু সমাধানের পদ্ধতি রচিত হল রাষ্ট্রীয় জীবনের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মধ্যে। অর্থাৎ একদিকে জাতীয়তা, অন্যদিকে গণতন্ত্র—এই দুইয়ের মিলনেই আধুনিক ইওরোপীয় রাষ্ট্রব্যবস্থার আদর্শ প্রতিষ্ঠিত।

বলা বাহুল্য, এটা আদর্শের কথা। বাস্তবে এই আদর্শ অনুযায়ী রাষ্ট্রসংগঠন ইওরোপের দেশগুলিতে রাতারাতি হয় নি। নানা দ্বন্দ্বসংঘাতযুদ্ধবিগ্রহের মধ্য দিয়ে আজকের ইওরোপের জাতীয় রাষ্ট্রগুলি গঠিত হয়েছে। জাতীয়তা আর গণতন্ত্রের মিলনও যে সব জায়গায় নিঃসংশয়ে ঘটেছে, এমন নয়। আর এই মিলনের আদর্শ বিশ্বের ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে সম্পূর্ণ বাস্তবায়িত হয়েছে, এমন কথা তো আদৌ বলা যায় না। কিন্তু উনবিংশ-বিংশ শতকে আধুনিক রাষ্ট্র-

ব্যবস্থার এই আদর্শই সারা বিশ্ব জুড়ে কায়েম হয়েছে। দক্ষিণ-আমেরিকা এবং পরে এশিয়া-আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে ঔপনিবেশিক শাসন উঠে গিয়ে যখন জাতীয় রাষ্ট্রের জন্ম হল, সেসব দেশের নতুন শাসকেরাও ঠিক ওই আদর্শ মেনেই তাদের নতুন রাষ্ট্রের কাঠামো তৈরি করল। আমাদের দেশেও ঠিক তাই হয়েছে।

৩

ভারতীয় রাষ্ট্রের অখণ্ডতার কথা বলতে গেলে প্রথমেই তাহলে মনে রাখতে হবে, এই অখণ্ডতার ইতিহাস মোটে চল্লিশ বছরের। (বস্তুত চল্লিশ বছর এখনো পূর্ণ হয় নি।) আমাদের সংবিধানে যার নাম দেওয়া হয়েছে 'ইনডিয়া, দ্যাট ইজ ভারত,' তার ভৌগোলিক সীমারেখা মূলত টেনে দিয়ে গেছে আমাদের প্রাক্তন শাসকেরা, অর্থাৎ ইংরেজরা। সেই সীমারেখার মধ্যে কিছু-কিছু রদবদল আমরা করেছি নিশ্চয়, যার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল দেশীয় রাজ্যগুলির অন্তর্ভুক্তি - সংবিধান রচনার ঠিক আগের পর্যায়ে। অন্তর্ভুক্তির পেছনে বহুলাংশে দেশীয় রাজ্যের অধিবাসীদের সংগঠিত দাবি ছিল নিশ্চয়, কিন্তু যে প্রক্রিয়ায় রাজ্যগুলিকে ভারতীয় ইউনিয়নের মধ্যে নিয়ে আসা হল তার মধ্যে গণতান্ত্রিক রাজনীতির ছিটেফোঁটাও ছিল না। অন্তর্ভুক্তি হল দেশীয় রাজাদের সঙ্গে চুক্তির মাধ্যমে। এ নিয়ে কিছু-কিছু ক্ষেত্রে গণ্ডগোল বেধেছিল, যেমন জুনাগড়ে। হায়দরাবাদে সেনাবাহিনী পাঠাতে হয়েছিল। আর কাশ্মীর নিয়ে বিবাদ তো পুরোপুরি আজও মেটে নি। ইংরেজদের নির্দেশিত সীমারেখার আরো কিছু ছোটো-ছোটো রদবদল আমরা করেছি—পাকিস্তান আর বাংলাদেশের সঙ্গে চুক্তির মাধ্যমে আর পর্তুগিজ আর ফরাসি উপনিবেশগুলোর স্বাধীনতা অর্জনের ফলে। আর-একটা বড়ো পরিবর্তন হয়েছে কয়েক বছর আগে ভারতীয় রাজ্য হিসেবে সিকিমের অন্তর্ভুক্তিতে। ইংরেজদের টানা সীমানা নিয়ে চীনের সঙ্গে আমরা মিটমাট করে নিতে পারি নি। তা নিয়ে একবার যুদ্ধ বেধেছে। আজও সেই সীমানা বিবাদের বিষয়।

প্রশ্ন উঠতে পারে, স্বাধীন ভারতীয় রাষ্ট্রের সীমানা যদি প্রাক্তন ঔপনিবেশিক শাসকেরাই ঠিক করে দিয়ে থাকে, তাহলে আমাদের জাতীয় আন্দোলনের তাৎপর্য কী? স্বাধীনতা তো আর ইংরেজরা দান করে যায় নি, ভারতবাসীর মিলিত সংগ্রামের ফলেই আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছি। সেই আন্দোলনের ফসল হিসেবে জন্ম নিয়েছে আজকের ভারতীয় রাষ্ট্র। সেই আন্দোলনের পুরোধা হিসেবে সংবিধান তৈরি করেছেন, সরকার চালিয়েছেন আমাদের জাতীয় নেতারা। নতুন ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় ঐক্যস্থাপনের পেছনে কি তাহলে একটা গণতান্ত্রিক প্রচেষ্টা ছিল না? অর্থাৎ জাতীয়তা আর গণতন্ত্রের যে মিলনের কথা আগে বলা হয়েছে, আমাদের ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম কোথায়? আমরাও তো সেইভাবেই আমাদের স্বাধীন রাষ্ট্র গড়েছি।

কথাটা ঠিক। কিন্তু কী অর্থে ঠিক আর কতটা ঠিক, তা বিবেচনাসাপেক্ষ। জাতীয় আন্দোলনের ক্রমবিকাশের বিভিন্ন পর্যায়ে ভারতবাসীর এক বিরাট অংশের গণতান্ত্রিক স্পৃহা যে সংগঠিত চেহারা নিতে পেরেছিল, তা সত্যি। এর মধ্যে কংগ্রেস-সংগঠিত আন্দোলনই ঐতিহাসিক দিক দিয়ে প্রধান। কিন্তু সেই সঙ্গে এটাও সত্যি যে কংগ্রেস আন্দোলনের যে নির্দিষ্ট সাংগঠনিক রূপ পরে রাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্রের আকার ধারণ করে, তার মধ্যে জাতীয়তা আর গণতন্ত্রের মিলন বহু দিক দিয়েই সীমিত আর অসম্পূর্ণ থেকে গেছে। এই অসম্পূর্ণতার মর্মান্তিক প্রকাশ হল দেশবিভাগ। কংগ্রেস আন্দোলনে জাতীয়তার যে আদর্শ সৃষ্টি হয়েছিল, তাতে ভারতবর্ষের হিন্দু-মুসলমান আলাদা জাতি হিসেবে স্বাধীন রাষ্ট্র গড়বে, এমন কথা ছিল না। বলা হয়, পাকিস্তান আন্দোলন এবং দেশবিভাগের আসল কারণ ব্রিটিশদের চক্রান্ত আর কিছু পশ্চাৎপদ ক্ষমতালোভী সাম্প্রদায়িক রাজনীতিকদের দুরভিসন্ধি। একথা যদি সত্যি হয় (সম্পূর্ণ সত্যি কি না তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। কারণ স্বাধীনতার পূর্বমুহূর্তে ভারতীয় মুসলিমদের বেশ বড়ো অংশের মধ্যে পাকিস্তান আন্দোলনের প্রতি সমর্থন ছিল, তা স্পষ্ট) তাহলেও বলতে হবে যে, সে চক্রান্ত যে দেশ ভাগ করতে সফল হল তা কংগ্রেস-পরিচালিত জাতীয় আন্দোলনের অক্ষমতার জন্যই। অর্থাৎ সে আন্দোলনের গণতান্ত্রিক ভিত যথেষ্ট ব্যাপক অথবা দৃঢ় ছিল না। অপরপক্ষে, চক্রান্তের তত্ত্ব যদি না মানি, তাহলে বলতে হয়—পাকিস্তান আন্দোলনেরও নিজস্ব গণতান্ত্রিক এবং জাতীয় সমর্থন ছিল আর সেই অনুপাতে কংগ্রেস আন্দোলনের গণতান্ত্রিক ক্ষেত্র ছিল সীমিত।

দ্বিতীয় প্রশ্ন ওঠে বর্তমান ভারতের সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলিকে নিয়ে। ব্রিটিশ অনুপ্রবেশ আর শাসনের বিরুদ্ধে উত্তরপূর্বের পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসীদের প্রতিরোধ দীর্ঘ এবং গৌরবময়। কিন্তু কংগ্রেস-পরিচালিত জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিল খুবই সামান্য, থাকলেও তা অত্যন্ত সাময়িক। ভারত ব্রিটিশ সরকারের অধীনে থাকার ফলেই স্বাধীনতার সময় ওই অঞ্চলগুলির ভারতবর্ষে অন্তর্ভুক্তির প্রশ্ন ওঠে। ক্ষমতাহস্তান্তরের সঙ্গে-সঙ্গে রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব ঔপনিবেশিক সরকারের হাত থেকে জাতীয় সরকারের হাতে চলে আসে। সেজন্য ব্রিটিশ আমলে রচিত সীমারেখাই নতুন রাষ্ট্রের সীমানা বলে ধরে নেওয়া হয়। উত্তর-পূর্বের অঞ্চলগুলি তাই ভারতবর্ষে এসেছে আইনের জোরে, কোনো গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে নয়। অর্থাৎ রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বই সেখানে কর্তৃত্বের ভৌগোলিক সীমারেখা স্থির করে দিয়েছে। জাতীয়তা আর গণতন্ত্রের সম্মিলিত কার্যকারণে সার্বভৌমত্বের জন্ম হয় নি।

তৃতীয় এবং সবচেয়ে জটিল প্রশ্ন ওঠে ভারতবর্ষের মূল ভূখণ্ডের জাতীয় আন্দোলনের চরিত্র নিয়ে। মোটামুটিভাবে বর্তমান শতাব্দীর দ্বিতীয় তৃতীয় দশক থেকে ভারতের জাতীয় আন্দোলনে বহুস্তর গণতান্ত্রিক ভিত্তিস্থাপনের সূচনা। মূলত গান্ধী-পরিচালিত দেশ-ব্যাপী গণ-আন্দোলনেই তার প্রকাশ। এ সময় শুধু যে ব্যাপক এলাকা জুড়ে ব্যাপক জনসাধারণকে সঙ্গে নিয়ে আন্দোলন হয়েছিল, তাই নয়। জাতীয় আন্দোলনের মূল আধার ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের জন্য সৃষ্টি হয়েছিল এক নতুন সাংগঠনিক কাঠামো। এই কাঠামোর দুটো বিশেষ দিক লক্ষ করার মতো। এক হল শীর্ষে কার্যকরী সমিতি ও নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি থেকে শুরু করে স্তরে-স্তরে প্রদেশ, জেলা, মহকুমা, তালুক, থানা, গ্রাম পর্যন্ত বিন্যস্ত সংগঠন। দীর্ঘ দিন ধরে আন্দোলন পরিচালনার মাধ্যমে এই সুবিন্যস্ত সংগঠন তার নিজস্ব চরিত্র আর কার্যকারিতা অর্জন করে। একদিকে স্থানীয় প্রয়োজন আর সামর্থ্য অনুসারে প্রত্যেক স্তরেই বেশ কিছুটা নিজস্ব উদ্যমের সুযোগ ছিল। এরই ফলে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে কংগ্রেসের গণসমর্থন তৈরি হয়। আবার এইজন্যেই পরবর্তী কালে কংগ্রেস যখন শাসকদল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হল, তখন স্থানীয় ক্ষমতার অধিকারী বিভিন্ন গোষ্ঠী আর শ্রেণী, বিশেষ করে গ্রামের জমিদার কিংবা সম্পন্ন কৃষকেরা, একেবারে দিল্লি পর্যন্ত সরাসরি তাদের আরজি পৌঁছে দিতে না পারলেও, স্থানীয় কংগ্রেস নেতাদের প্রভাবিত করে প্রাদেশিক অথবা জেলা স্তরে বিভিন্ন সুযোগসুবিধা আদায় করে নিতে পারত। অন্যদিকে সংগঠনের ওপরতলা থেকে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের নিয়ন্ত্রণের সুযোগও ছিল যথেষ্ট। সেই নিয়ন্ত্রণের ফলেই গণ-আন্দোলনের তীব্রতার চরম মুহূর্তে রাশ টেনে ধরা সম্ভব হত কংগ্রেস নেতাদের পক্ষে, আন্দোলন যাতে তাদের দ্বারা নির্দিষ্ট রাজনৈতিক গণ্ডির বাইরে উপচে না পড়ে। সব মিলিয়ে গণতান্ত্রিক উদ্যমও যেমন ছিল, তাকে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের ইচ্ছানুসারে নিয়ন্ত্রণে রাখার ব্যবস্থাও ছিল।

স্বাধীনতা-আন্দোলনের সময়কার কংগ্রেসের দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য দিক হল এর ভাষাভিত্তিক প্রাদেশিক সংগঠন। ১৯২০ সালে অসহযোগ আন্দোলনের প্রাক্কালে যখন কংগ্রেসকে নতুন করে ঢেলে সাজানো হয়, তখন প্রাদেশিক স্তরে তৎকালীন ঔপনিবেশিক সরকারের প্রশাসনিক সীমারেখা মেনে চলা হয় নি। প্রাদেশিক কংগ্রেসের এলাকা নির্দিষ্ট হল ভাষাভিত্তিক অঞ্চল অনুসারে। বোমবাই প্রদেশে যেমন মহারাষ্ট্র আর গুজরাত, দুটি পৃথক প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি ছিল। (বোমবাই শহরের জন্য ছিল আরো একটি প্রাদেশিক কমিটি।) মাদ্রাজ প্রদেশে ছিল তামিল, তেলুগু আর মালয়ালম-ভাষী অঞ্চলের জন্য আলাদা-আলাদা কমিটি। কাছাড় আর শ্রীহট্ট জেলা তখন ছিল আসামের অংশ, কিন্তু কংগ্রেস সংগঠনে যেখানকার জেলা কমিটিগুলি এল বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটির আওতায়। ভাষাভিত্তিক প্রাদেশিক সংগঠন গড়ার গেছনের যুক্তিটা আপাত-দৃষ্টিতে নিছকই সাংগঠনিক সুবিধা। আদিযুগের সুট-বুট-পরিহিত ইংরেজিনবীশ 'নরমপন্থী' নেতাদের পেছনে ফেলে রেখে কংগ্রেস তখন গণ-আন্দোলনের পথে যাচ্ছে। রাজনীতির ভাষা হিসাবে ইংরেজি অচল হয়ে না গেলেও গণসংযোগের ক্ষেত্রে তার ব্যবহার সীমিত হতে বাধ্য ছিল। প্রাদেশিক স্তরের নীচে কংগ্রেসের কাজ এখন থেকে আঞ্চলিক ভাষায় হওয়াটাই ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু কাজের সুবিধার যুক্তিটা আসলে আরো তাৎপর্যপূর্ণ এক রাজনৈতিক সত্যের বহিঃপ্রকাশ। ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে ভারতীয় জনগণের রাজনৈতিক সংগ্রামে জাতীয়তা আর গণতন্ত্রের মিলনের প্রাথমিক ক্ষেত্র ছিল ভাষা-ভিত্তিক গোষ্ঠীগুলি। সেখানেই ছিল জাতীয় ঐক্য-রচনার সবচেয়ে শক্তিশালী ভিত্তি।

স্বাধীনতা-আন্দোলনের পর্বে নির্মিত সাংগঠনিক কাঠামোই পরবর্তী কালে ভারতীয় যুক্তরাজ্যব্যবস্থার মূল আদল হয়ে দাঁড়ায়। একদিকে রাজনৈতিক ক্ষমতা কেন্দ্র থেকে জেলা-মহকুমা পর্যন্ত বিভিন্ন স্তরে বিন্যস্ত থাকে। অন্যদিকে ভাষাভিত্তিক রাজ্যগঠন মোটামুটিভাবে সম্পূর্ণ হয় স্বাধীনতার প্রথম দুই দশকে। দ্বিতীয় ঘটনাটা সহজে ঘটে নি। ক্ষমতা পেয়ে কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতারা পুরনো ঔপনিবেশিক শাসনযন্ত্রের অনেকটাই অক্ষত রেখে চলার পন্থা নেন। প্রশাসনিক এবং আইনব্যবস্থার যেমন কোনো মৌলিক পরিবর্তনের চেষ্টাই হয় না। সেরকম চিন্তা থেকে অনেকে বলতে শুরু করলেন যে ভাষার ভিত্তিতে রাজ্য গঠিত হলে আঞ্চলিকতার প্রবণতা বেড়ে যাবে, কেন্দ্রীয় শাসনের ভিত আলগা হয়ে পড়বে। যুক্তিটা ধোপে টিঁকল না, কারণ অন্ধ্রে, মহারাষ্ট্রে, গুজরাতে পানজাবে ভাষাভিত্তিক রাজ্য স্থাপনের দাবি অপ্রতিরোধ্য হয়ে দাঁড়াল।

সম্প্রতি অনেকের মুখেই শুনছি, দেশে আঞ্চলিকতা আর বিচ্ছিন্নতার সূত্রপাত নাকি ঐ ভাষা-ভিত্তিক রাজ্যগঠন থেকেই। যুক্তিটা উদ্ভট। এর পেছনে ধারণাটা হল, ভারতবর্ষকে শাসন করতে হয় সাম্রাজ্যের কায়দায়, ইংরেজরা যেভাবে করত। অর্থাৎ জনসাধারণের মধ্যে গণতান্ত্রিক ঐক্যের সম্ভাবনাকে যত দিক দিয়ে সম্ভব খর্ব করে। যুক্তিটা আসলে যুক্তরাজ্যব্যবস্থারই বিরুদ্ধে, কারণ এর মূলে রয়েছে এমন একটা চিন্তা যে শক্তিশালী রাষ্ট্রীয় ঐক্য মানে কেন্দ্রীয় সরকারের অপ্রতিহত কর্তৃত্ব। জোর করে এরকম একটা ব্যবস্থা চাপিয়ে দিতে চাইলে গোটা রাষ্ট্রীয় কাঠামোটাই বিপর্যস্ত হয়ে যেতে পারত।

৪

১৯৫০-৬০-এর বছরগুলোতে অন্ধ্র, মহারাষ্ট্র, পানজাবে ভাষার ভিত্তিতে রাজ্যগঠনের আন্দোলন যথেষ্ট ব্যাপক, শক্তিশালী এবং সময়-সময় হিংসাত্মক হয়েছিল। তখন এই ধরনের আন্দোলনকে 'বিচ্ছিন্নতার' আন্দোলন বলা হত না, বলা হত 'আঞ্চলিকতা'। ভারতবর্ষের মূল ভূখণ্ডের আন্দোলন এগুলি। সেখানকার জনসমষ্টির কোনো আন্দোলনের পেছনে ভারতবর্ষ থেকে আলাদা হয়ে যাওয়ার প্রচ্ছন্ন ইচ্ছা থাকতে পারে, এমন আশঙ্কা বিশেষ কেউ করত না। বিচ্ছিন্নতার দাবি দেখা দিয়েছিল অন্যত্র—উত্তর-পূর্ব কোণে নাগাল্যানডে, মিজোরামে। বলতে বাধা নেই, দীর্ঘদিন ধরে ভারতীয় সেনাবাহিনীর উপর্যুপরি আক্রমণে বিদ্রোহীদের পর্যুদস্ত করে দমন করা হয় সেই আন্দোলন। আজ সেইসব অঞ্চলে সাংবিধানিক রাজনীতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু সেখানকার মানুষের জাতীয়তার স্পৃহা ভারতরাষ্ট্রের দেহে সম্পূর্ণ লীন হয়েছে বলা যায় কি?

আঞ্চলিক রাজনীতির সম্ভাবনা ভারতীয় রাষ্ট্রের যুক্তরাজ্য-কাঠামোর মধ্যে সব সময়ই উপস্থিত। যতক্ষণ পর্যন্ত তা সাংবিধানিক প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে, ততক্ষণ রাষ্ট্রপ্রধানেরা তা নিয়ে বিশেষ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হন না। বস্তুত অনেক ক্ষেত্রেই বলা হয়ে এসেছে যে বিভিন্ন ভাষা-ধর্ম-সংস্কৃতির ভেদাভেদের মধ্যে রাষ্ট্রীয় ঐক্য অক্ষুণ্ণ রাখতে হলে কিছুটা পরিমাণে আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্য মেনে নিতেই হবে। এটাই ছিল নেহরু আমলের কংগ্রেসের শাসনপদ্ধতির মূল কৌশল। গত দশ-পনেরো বছরে কিন্তু এই শাসনপদ্ধতি সম্পূর্ণ বদলে গেছে। একদিকে অর্থনীতি পরিচালনার প্রয়োজনে, অন্যদিকে কংগ্রেসের দলীয় সংগঠনের দুর্বলতা আর ইন্দিরা গান্ধীর ব্যক্তিগত জন-প্রিয়তার ওপর নির্ভরশীলতার ফলে ১৯৭০-৭১ সাল থেকেই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার প্রচণ্ড কেন্দ্রীকরণ ঘটেছে। শুধু যে আর্থিক ক্ষমতা রাজ্যগুলির হাত থেকে কেন্দ্রের হাতে চলে গিয়েছে, তাই নয়। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সরকার পরিচালনা এবং ভারতের প্রধান শাসকদল কংগ্রেসের নিজস্ব সাংগঠনিক প্রক্রিয়া দুটোতেই নতুন দিল্লীর সর্বোচ্চ নেতৃত্বের নিয়ন্ত্রণ বেড়ে গেছে অভূতপূর্ব পরিমাণে। শাসকদলের প্রাদেশিক শাখার মতামত না জেনেই আজকাল রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী কিংবা মন্ত্রী-পরিষদের অদলবদল করা হয়। শুধু সংসদের নির্বাচনেই নয়, বিধানসভা-পুরসভা-পঞ্চায়েত নির্বাচনে পর্যন্ত কংগ্রেসের প্রার্থী-তালিকা রচিত হয় দিল্লিতে বসে—আগে যা ছিল অকল্পনীয়।

এর পরিণাম হয়েছে এই যে শাসনকার্যে বিভিন্ন গোষ্ঠীস্বার্থের মধ্যে সমঝোতা আনার সুযোগ অনেক কমে এসেছে। কেন্দ্রীয় স্তরে যাদের প্রভাব বেশি, তাদের মতটাই বেশি প্রাধান্য পাচ্ছে। প্রাদেশিক বা আঞ্চলিক স্তরে নিজস্ব উদ্যোগ নেবার সুযোগ প্রায় নেই বললেই চলে। এর ফলে স্বভাবতই আঞ্চলিক স্তরে বিক্ষোভ পুঞ্জীভূত হয়েছে। উত্তর-দক্ষিণ-পূর্ব ভারতের অনেক রাজ্যেই এর প্রকাশ দেখা যাচ্ছে আঞ্চলিক বিরোধী দলের নির্বাচনী সাফল্যে। ১৯৫৪-৫৫ সালে অন্ধ্রের আঞ্চলিক রাজনীতি প্রচণ্ড শক্তিশালী ছিল। কিন্তু অন্ধ্র রাজ্য গঠনের পর সেই-সব আঞ্চলিক শক্তিকে কংগ্রেস নিজেই তার কক্ষ-পুটে নিয়ে আসতে পেরেছিল। আজ তা পারছে না, ফলে অন্ধ্রে শাসন করছে তেলেগু দেশম। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে এই ঘটনা নানাভাবে ঘটে চলেছে।

ভারতবর্ষের মতো দেশে শাসনকার্য চালানোর ব্যাপারে কেন্দ্রীয় শক্তিকে যতই জোরদার করার চেষ্টা হবে, আঞ্চলিকতা ততই প্রবলতর হবে এবং কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে চাইবে। আসলে বর্তমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে আর্থিক মান আর সুযোগসুবিধার অসাম্য দূর করা অসম্ভব। বরং অসাম্য বেড়ে যাওয়ার প্রবণতাটাই অনেক বেশি শক্তিশালী। ফলে বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে বিক্ষোভ অবশ্যম্ভাবী। নানা ধরনের ঐক্যের মধ্যে দিয়ে এই বিক্ষোভ প্রকাশ পেতে পারে। ঐক্য যেখানে আঞ্চলিক ভিত্তি পায়, যেমন ভাষাগত মিলনে (অথবা পানজাবে—ভাষা আর ধর্মের মিলনে), সেখানে বিক্ষোভ আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্যের দাবি নিয়ে উপস্থিত হয়। সেই বিক্ষোভ সাংবিধানিক কাঠামোর মধ্যে বেঁধে রাখার সুযোগ অনেক দিন পর্যন্ত ছিল। আজ ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণের চাপে সে সুযোগ নিদারুণ-

ভাবে সংকুচিত হয়ে এসেছে। আর যেখানে আঞ্চলিক ঐক্যবন্ধনের সুযোগ নেই, যেমন জাতপাতের রাজনীতিতে কিংবা ধর্মীয় অথবা ভাষাগত সংখ্যালঘুদের ক্ষেত্রে, সেখানে বিক্ষোভ প্রকাশ পায় সংখ্যালঘুদের বিশেষ সুযোগসুবিধার দাবি হিসেবে। দু ধরনের দাবিই আজ প্রবল থেকে প্রবলতর হতে চলেছে।

তবে সমাধান কী? আমার নিশ্চিত বিশ্বাস, বর্তমান সাংবিধানিক কাঠামোয় কোনো দীর্ঘস্থায়ী সমাধান অসম্ভব। প্রয়োজন সম্পূর্ণ নতুন এক যুক্তরাজ্য, অনেক বেশি পরিমাণে বিকেন্দ্রীকৃত এক সাংবিধানিক ব্যবস্থা। বিকেন্দ্রীকরণের মূল নীতি হওয়া দরকার ভারতীয় জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার। একমাত্র এই নীতিতেই ভারতীয় রাষ্ট্রব্যবস্থার সংকুচিত গণতন্ত্রের ক্ষেত্র প্রসারিত হওয়া সম্ভব। কোনো গণতান্ত্রিক স্বর্গরাজ্যের অলীক কল্পনার কথা আমি বলছি না। বলছি বাস্তব সংকটের বাস্তব সমাধানের সম্ভাবনার কথা। আত্মনিয়ন্ত্রণের প্রধান স্তর স্বভাবতই হবে বর্তমান ভারতীয় ভাষাগোষ্ঠীগুলিকে নিয়ে। প্রত্যেক প্রধান ভাষাগোষ্ঠীকে অধিকার দিতে হবে যুক্তরাজ্যে প্রবেশ করার এবং তা থেকে বেরিয়ে যাওয়ার। কিন্তু শুধু এই ভাষাগোষ্ঠীগুলিকেই নয়, নীতিগতভাবে যে-কোনো ব্যাপক জনগোষ্ঠীকেই এই অধিকার দিতে হবে। পরিণামে যে যুক্তরাজ্য গঠিত হবে, তার ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হবে আইনের সার্বভৌমত্বের জোরে নয়, জনগণের গণতান্ত্রিক ইচ্ছায়।

রাষ্ট্রীয় ঐক্য এতে দুর্বল হবে না, আরও শক্তিশালী হবে। সামাজিক ঐক্য সম্বন্ধে আমাদের অনেকেরই ধারণা সম্পূর্ণ রাষ্ট্রকেন্দ্রিক। তাই আমরা মনে করি কেন্দ্রীয় শাসন জোরদার হলেই দেশ শক্তিশালী হয়। সেনাবাহিনীর হাতে অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র তুলে দিলে দেশের শক্তি বাড়ে। এ ধারণা অমূলক। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রশাসনিক কিংবা সামরিক শক্তি বৃদ্ধি পেলে ক্ষমতা বাড়ে আসলে সমাজের সেইসব শাসকগোষ্ঠীদের যাদের স্বার্থ আর ক্ষমতা রাষ্ট্রের কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থিত। এই শক্তিবৃদ্ধির অর্থ আসলে দেশের বৃহত্তর জনসাধারণের শক্তিহ্রাস। জাতীয় সংহতিবৃদ্ধির অজুহাতে ক্ষমতা কেন্দ্রীকরণের এই চেষ্টা দেশের ঐক্যকে প্রসারিত করার বদলে ক্রমাগতই বিপর্যস্ত করে। আমাদের বর্তমান সংকট থেকে যদি কোনো ঐতিহাসিক শিক্ষা নেবার থাকে—তা হল এই।

জাতীয় গোষ্ঠীগুলির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার স্বীকার করা মানেই যে প্রত্যেকে পৃথক-পৃথক রাষ্ট্র গড়তে চাইবে, এমন নয়। পৃথক থাকার চেয়ে জোটবদ্ধ থাকা যদি সকলের পক্ষেই মঙ্গলজনক হয়, তাহলে সে কথা আপনি-আমি বুঝতে পারব অথচ আপামর জনসাধারণ বুঝতে পারবে না—এ ধারণা একান্তই উন্নাসিক। আসলে একত্র থাকার সুবিধেটুকু অল্প কিছু লোকে কুক্ষিগত করছে—এই সন্দেহই বিচ্ছিন্নতার জন্ম দেয়। সেই সন্দেহের বাস্তব নিরসন প্রয়োজন। বর্তমান রাষ্ট্রব্যবস্থার মধ্যে তার কোনো সুযোগ অবশিষ্ট আছে বলে মনে হয় না। অনেক বেশি ব্যাপক আর গভীর গণতান্ত্রিক রাজনীতির প্রয়োজন হয়ে পড়েছে আজ। আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের দাবি নিয়েই তার সূত্রপাত সম্ভব। ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের কথা প্রায় সকলেই বলে থাকেন। কিন্তু বিকেন্দ্রীকরণের কোনো বাস্তব রাজনৈতিক ভিত্তি খুঁজে পাওয়া যায় নি। আসলে বিকেন্দ্রীকরণের সুবিধা দেখতে পাওয়া সত্ত্বেও রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বের মোহ আমরা কাটিয়ে উঠতে পারি নি। তাই সামাজিক ক্ষমতার কেন্দ্রে বসে আজকের সংকটময় পরিস্থিতির মধ্যেও নতুন কোনো মৌলিক চিন্তার ঝুঁকি নিতে পারছি না।

ঝুঁকি না নিলে সংকট থেকে উদ্ধার পাওয়া যাবে কি? পুলিস-মিলিটারির ক্রমবর্ধমান প্রতাপ আর আমাদের সমবেত বিলাপের জোরে জাতীয় বন্ধন অটুট রাখা যাবে?

খসে পড়ে বিষাদী-পালক

মতি মুখোপাধ্যায়

সব খেলাতেই থাকে দুই মেরু : আনন্দ বিষাদ
কিন্তু মাঝখানে
গোলকের মতো এই জীবনের টান-টান বিষুবরেখায়
অস্তি-নাস্তির দ্বন্দ্ব
যেরকম তুমি
প্রতিদিন যুদ্ধে শান্তিতে।

'এভাবে সংগ্রাম করে জীবন-কাটানো, যায় নাকি
অন্তিমেও যুদ্ধ-যুদ্ধ খেলা'
পায়রা ওড়ার শব্দে, সহর্ষ বিষাদে বলেছিলে
সংশয়ে ধূসর চোখ, ভ্রূ-নামের পাখি
উড্ডীন ভঙ্গিতে ছিল
অসুখের চৌকাঠ ডিঙিয়ে যেতেও
যে কারণে খুলেছিলে সুখের পোশাক।

দুই মেরু ছুঁয়ে সে-ও খেলা
বাঁশি না বাজার আগে মাঠ ছেড়ে যাওয়া
নিয়মবিরুদ্ধ জেনে,—তাও
ভরাট আনন্দযজ্ঞে কখনো কোথাও
কারো দীর্ঘশ্বাস
গভীর গভীরতম নীলিমার থেকে
এভাবেই খসে পড়ে স্মৃতিময় বিষাদী-পালক।

জারুলের ধ্বনি

মঞ্জুভাষ মিত্র

এই ধ্বনি শুধু ছুঁয়ে-ছুঁয়ে যাক তোমাকে
যা আমি শুনেছি নরম-বেগুনি জারুলের ভীরু ফুলের মূলে
মৃদু কান পেতে; যা আমি নিয়েছি মধুর দুহাতে
সন্ন্যাসিবৎ রুক্ষ চিত্র বুকের ভিতর মুখের ভিতর
দিন চলে যায় ফিরবে না আর
তবু এই ধ্বনি জাগ্রত হল, লক্ষ করছে তোমাকে

আমার চিন্তাবীণার রচনা এই যে বেগুনি ফুল
সাগরের নীল পথে যেতে কবে দেখেছি তোমার কালো চুল

জারুলের ধ্বনি বনপথে যেতে
চিন্তাবীণার চরম রচনা গ্রীষ্মকুসুম ভয়চুম্বিত ফুল
ছুটে চলে যাক বিদ্ধ করুক পাপড়ি তোমার আমাকে

হার্জ পাহাড়ে ফাউস্ট

আনন্দ ঘোষ হাজরা

'গ্রেট্‌সেইন্, গ্রেট্‌সেইন্'—বলে হার্জ পাহাড়ে কেঁদে বেড়াচ্ছেন ফাউস্ট
আর এক সুভদ্র শয়তান তাঁকে ম্যাজিক দেখাচ্ছে।
ধোঁয়ার মণ্ডলে ভরে গেল সানুদেশ
অন্ধকার চূড়ার দিকে সর্পিল পথ
লাল হয়ে উঠছে উপত্যকার আগুনে
'গ্রেট্‌সেইন্, গ্রেট্‌সেইন্'—বলে হার্জ পাহাড়ে কেঁদে বেড়াচ্ছেন ফাউস্ট
আর এক অনন্ত শয়তান তাঁকে ছবি দেখাচ্ছে।

ফাউস্ট সুন্দরী রমণীর শরীর দেখছেন
ফাউস্ট প্রেতযোনির ছবি দেখছেন
ফাউস্ট অগুরুচন্দনের গন্ধ পাচ্ছেন
ফাউস্ট পচা মাংসের গন্ধ পাচ্ছেন
আর 'গ্রেট্‌সেইন্, গ্রেট্‌সেইন্' বলে কেঁদে উঠলেই দেখতে পাচ্ছেন
দূরে পর্বতচূড়ায় বিশাল কড়াই আর ফুটন্ত তেল।

গ্রেট্‌সেন্, তোমার কারাগারের পাশ দিয়ে
এই সুন্দর সকালে দিগ্বলয় পার হয়ে
উড়ে যাচ্ছে তিনটে সাদা হাঁস;
ওরা আর ফিরবে না।
ফাউস্ট একটা হাঁসের জন্য হার্জ পাহাড়ে কেঁদে বেড়াচ্ছেন
আর এক সুভদ্র শয়তান তাঁকে ক্রমাগত ম্যাজিক দেখাচ্ছে!

অন্য অনন্তের জন্য

সোফিওর রহমান

গেরুয়া কৌপিন ছেড়ে এ দেহে
কার্যমথিত ফেনার মুকুট, আলো ও আঁধারের ধূসর মোহরগুলি
শ্যাওলাধরা শতাব্দীর বেতাল শব্দজালে
খোঁজে তৃতীয় নয়নের রঞ্জনরশ্মি ;
আমাদের অনিদ্রার ঘরবাড়ি জুড়ে খণ্ডদীনবিষণ্ণ জীবনপ্রণালী
পরিত্যক্ত বারান্দায় গাঢ় রঙ খোঁজে, যুবরাজসংগীত।
তবু কেন অডিটরিয়ামে ঝাঁঝালো চোখের ঘ্রাণ—
পোড়ায় সভামঞ্চের প্রার্থনার ফসল, ফসিল হবে পৃথিবীর সব বীজ?
প্রেতগ্রস্ত কুয়াশা ঝরাবে জীবনের মুকুল?
গেরুয়া কৌপিন ছেড়ে আজ এ দেহে কর্মমন্ত্র মননের মোতিহার,
মজে-আসা নদীর রক্তে নিসর্গ, সবুজ শস্যের অঞ্জন
দুইহাতে নীল শালুকের কুসুম।
আমাদের ছদ্মবেশী গেরস্থালির সব মেকি গতি
অজন্মা শব্দগর্ভে খোঁজে ক্ষণজন্মের শ্রাবণ, অনন্তের বিবৃতি…

রবীন্দ্রনাথের বৈজ্ঞানিক ব্যাকরণের ধারণা

মনসুর মুসা

পূর্বসূত্র

প্রথম তিনটি বাঙলা ব্যাকরণ বাঙালির ভাষাচিন্তার মৌলিক ফসল নয়, বিদেশী পণ্ডিতের বাঙলা ভাষার নিয়ম অনুসন্ধানের প্রয়াস। হ্যালহেড, কেরী এবং হোটন বাঙলা ভাষা শিক্ষণ আর প্রশিক্ষণের জন্য যে ব্যাকরণ রচনা করেন, তাতে সংস্কৃত, লাতিন আর পারসি ব্যাকরণের নিয়মকানুন প্রয়োগের অসহায় প্রয়াস লক্ষ করা যায়। তাই পরবর্তী কালে রামমোহন এসব ব্যাকরণের সমালোচনা করেছেন, এবং নিজেই গৌড়ীয় ব্যাকরণ রচনা করে পূর্ববর্তী ব্যাকরণের সীমাবদ্ধতা নির্দেশ করে গেছেন। বাঙলা ব্যাকরণের অসম্পূর্ণতাবোধ এবং সংস্কৃতনির্ভরতা পরবর্তী কালে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, শ্যামাচরণ সরকার এবং সে যুগের অনেকেই বুঝতে পেরেছিলেন।

বাঙলা ব্যাকরণের অসম্পূর্ণতাবোধ এবং সংস্কৃত-নির্ভরতার সমালোচনা ব্যাপকভাবে শুরু হয় 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ' প্রতিষ্ঠার পর থেকে। অবশ্য 'সারস্বত সমাজ'-ও এ ধরনের কর্মের উদ্যোগ নিতে চেয়েছিল, কিন্তু প্রতিষ্ঠানটি দীর্ঘজীবন লাভ করতে পারে নি। পরিষদের প্রতিষ্ঠার পর থেকেই প্রকৃত বাঙলা ব্যাকরণ রচনার দাবি সজোরে উত্থিত হয়। জন বীম্‌স্ তাঁর **Grammar of the Bengali Language—Literary and Colloquial** গ্রন্থের একটি সংশোধিত এবং পরিবর্ধিত কপি সাহিত্য পরিষদে আলোচনার জন্য পাঠিয়েছিলেন। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ১লা এপ্রিলের সভায় বইখানা সমালোচনার জন্য হীরেন্দ্রনাথ দত্তকে দেওয়া হয়। ১২ই এপ্রিল ১৮৯৪ বীম্‌সের বইয়ের সমালোচনা করেন হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, এবং অন্যান্য পরিষদ-সদস্য তাঁর সাথে ঐকমত্য প্রকাশ করেন। এই সময়ে দুজন বিদেশী—উইলিয়ম উইলসন হানটার এবং অধ্যাপক মোক্ষমূলার—বিজ্ঞানসম্মত বাঙলা ব্যাকরণ রচনার প্রয়োজনের দিকে পরিষদ-সদস্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এসবই

লেখক বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। ভাষাতত্ত্ব অধ্যয়ন করেছেন ইংল্যানডে আর আমেরিকায়। তাঁর আগ্রহ সমাজভাষাতত্ত্বে এবং মনোভাষাবিজ্ঞানে। ভাষা-সমস্যা নিয়ে বহু প্রবন্ধের লেখক। সম্প্রতি প্রকাশিত তাঁর বইয়ের নাম (১) "ভাষা-পরিকল্পনা ও অন্যান্য প্রবন্ধ", (২) "বাঙলা পরিভাষা : ইতিহাস ও সমস্যা", (৩) "ভাষা-পরিকল্পনার সমাজভাষাতত্ত্ব।"

১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের বা ১৩০০ বঙ্গাব্দের ঘটনা। ১৩০৫-এ রবীন্দ্রনাথ বীমসের বাঙলা ব্যাকরণ শীর্ষক আলোচনা প্রকাশ করেন "ভারতী" পত্রিকার পৌষ সংখ্যায়।

ব্যাকরণ-ভাবনা

বাঙলা ব্যাকরণের অপূর্ণতা এবং সংস্কৃতনির্ভরতার কথা সে-যুগের অন্যান্য পণ্ডিত যেমন উপলব্ধি করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথও উপলব্ধি করেছিলেন। "বাঙলা উচ্চারণ" শীর্ষক তাঁর প্রবন্ধের উপসংহারে তিনি বলেছেন, 'প্রকৃত বাঙলা ব্যাকরণ একখানিও প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত ব্যাকরণের একটু ইতস্ততঃ করিয়া তাহাকে বাঙলা ব্যাকরণ নাম দেওয়া হয়।' এই অনুযোগ আরো অনেকেই করেছেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী করেছেন, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীও করেছেন। রবীন্দ্রনাথ এবং আরো অনেকেই বাঙলা ব্যাকরণ যে সংস্কৃত ব্যাকরণসূত্রের প্রভাবে আড়ষ্ট হয়ে পড়েছে, এ সম্পর্কে সবিস্তারে আলোচনা করেছেন। প্রকৃত বাঙলা ব্যাকরণের অভাবের কথা একাধিক প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন : "বাঙলা ব্যাকরণ" সংক্রান্ত প্রবন্ধে লিখেছেন, বীমসের বাঙলা ব্যকরণের সমালোচনা প্রসঙ্গে লিখেছেন আর লিখেছেন তাঁর শব্দতত্ত্বে সংগৃহীত ব্যাকরণ ও বাঙলাভাষা সংক্রান্ত প্রবন্ধাদিতে। তিনি বার-বার যোগ্য লোকদের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন যথার্থ বাঙলা ব্যাকরণ রচনার উদ্যোগ গ্রহণের জন্য। প্রকৃতপক্ষে তাঁর উৎসাহে কেউ-কেউ বাঙলা ভাষার বিভিন্ন বিষয় অবলম্বনে প্রবন্ধ লিখেছেন সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায়। অথচ এখনও স্বীকার করতে পারা যায় না যে প্রকৃত বাঙলা ব্যাকরণ একখানাও রচিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সুনীতি-কুমার চট্টোপাধ্যায় বাঙলা ব্যাকরণ লিখেছেন, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ লিখেছেন, মুহম্মদ এনামুল হক লিখেছেন। কিন্তু সংস্কৃত ব্যাকরণের প্রভাব-মুক্ত হওয়ার সচেতন প্রয়াস সত্ত্বেও সংস্কৃত ব্যাকরণের অধি-শব্দ (Meta-word) বা পারিভাষিক শব্দ ব্যবহার না করে পণ্ডিতেরা ব্যাকরণ রচনা করেন নি। রবীন্দ্রনাথ **বৈজ্ঞানিক বাঙলা ব্যাকরণ** রচনার একটি আইডিয়াও প্রকাশ করেছিলেন। সে ভাবটা বা আইডিয়াটা তিনি কীভাবে অর্জন করেছিলেন তার পটভূমিটা জানা প্রয়োজন।

ব্যক্তিগত পটভূমি

রবীন্দ্রনাথের বয়স যখন মাত্র সতেরো বছর, তখন তিনি বিলাত গিয়েছিলেন। বিলাতে দেড় বছর অবস্থান করার পর পিতার আদেশে দেশে ফিরে আসেন। বিলাতে অবস্থানকালে তিনি ডাকতার স্কটের একটি কন্যাকে বাঙলা শেখানোর চেষ্টা করে-ছিলেন। তাঁকে বাঙলা শেখাতে গিয়ে বাঙলা ভাষার বন্ধনহীনতার বাস্তবতা তাঁর চোখে পড়ে। এ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—'তাঁহাকে বাংলা বর্ণমালা শিখাইবার সময় গর্ব করিয়া বলিয়াছিলাম যে, আমাদের ভাষায় বানানের মধ্যে একটা ধর্মজ্ঞান আছে, পদে পদে নিয়ম লঙ্ঘন করাই তাহার নিয়ম নহে।···কিন্তু আমার গর্ব টিঁকিল না। দেখিলাম, বাঙলা বানানও বাঁধন মানে না; তাহা যে ক্ষণে ক্ষণে নিয়ম ডিঙ্গাইয়া চলে অভ্যাসবশত এতদিন তাহা লক্ষ্য করি নাই। তখন এই নিয়ম-ব্যতিক্রমের একটা নিয়ম খুঁজিতে প্রবৃত্ত হইলাম।' বোঝা যাচ্ছে, বাঙলা ভাষার নিয়ম-ব্যতিক্রম সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের আগ্রহ সতেরো-আঠারো বছর বয়সেই জেগেছিল এবং বিদেশিনীকে বাঙলা শেখাতে গিয়েই তাঁর মনে এ আগ্রহের সূচনা ঘটে। রবীন্দ্রনাথের চেতনায় এ আগ্রহ দীর্ঘদিন অনির্বাণ ছিল এবং বাঙলা ভাষার নিয়ম আবিষ্কারের জন্য তিনি বাক্‌সভর্তি নোট সংগ্রহ করেছিলেন এবং সেসব নোট বিলাত থেকে দেশে নিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু যখন কাজ করতে গিয়ে

পুরানো কাগজপত্র বের করতে গেলেন তখন দেখতে পেলেন কবির কন্যারত্ন ব্যাকরণের নোটগুলো ফেলে দিয়ে বাক্‌সের মধ্যে তার পুতুল সংরক্ষণ করছে। এ-কাহিনী বলেছেন রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতিতে। রবীন্দ্র-নাথের ভাষাসংক্রান্ত প্রথম রচনা "বাঙলা উচ্চারণ" ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের আশ্বিন সংখ্যা "বালক" পত্রিকায়। কেউ-কেউ মনে করেন, এ তাঁরই সংশয়পূর্ণ। তা যদি না হয় তবে বলতে হয়, ১৭-১৮ বছর বয়সে যে অভিজ্ঞতা তিনি বিদেশে সঞ্চয় করেছিলেন তাই ২৪ বছর বয়সে প্রথম ভাষাতাত্ত্বিক প্রবন্ধে প্রকাশিত হয়। এরপর "স্বরবর্ণ অ" "স্বরবর্ণ এ" এবং "টা টো টে" প্রকাশিত হয় ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দের "সাধনা" পত্রিকার আষাঢ়, কার্তিক আর অগ্রহায়ণ সংখ্যায়। তারপর তাঁর ভাষা-সম্পর্কিত অন্যান্য রচনাবলী প্রকাশিত হয়। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে প্রকাশিত এ ধরনের ২৩টি প্রবন্ধের সংকলন হল "শব্দতত্ত্ব" (১৯০৯)। তাঁর অপর গ্রন্থ "বাংলা ভাষা পরিচয়" সংকলন-গ্রন্থ নয়, একক-বিষয়ক গ্রন্থ, গ্রন্থাকারেই লিখিত এবং সেটি প্রকাশিত হয় ১৯৩৮-এ। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ জীবনের সতেরো থেকে আরম্ভ করে পরবর্তী প্রায় পঞ্চাশ বছর যাবৎ নানাভাবে ভাষা-চিন্তা করেছেন। এর মধ্যে বাঙলাভাষাচিন্তাই তাঁর মূল বিষয়। তাঁর ভাষাচিন্তার যখন কুড়ি বছর পূর্ণ হয় তখন তিনি ১৩১২ সালের বৈশাখে "ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ" দান কালে বাঙলা ভাষায় বৈজ্ঞানিক ব্যাকরণ রচনার কথা উল্লেখ করেন। তাঁর বৈজ্ঞানিক ব্যাকরণের আইডিয়া তাঁর উক্তিতে উপলব্ধি করা যাক। বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলা থেকে ছাত্ররা কলকাতায় সমবেত হয় এবং তারা সহায়তা করলে বাংলাদেশের নানা বৃত্তান্ত উদ্ঘাটন সম্ভব। এ কথার দৃষ্টান্ত হিসেবে তিনি বলেন,

'বাংলা ভাষায় একখানি ব্যাকরণ-রচনা সাহিত্য-পরিষদের একটি প্রধান কাজ। কিন্তু কাজটি সহজ নহে। এই ব্যাকরণের উপকরণ-সংগ্রহ একটি দুরূহ ব্যাপার। বাংলাদেশের ভিন্ন-ভিন্ন অংশে যতগুলি উপভাষা প্রচলিত আছে তাহাদের তুলনাগত ব্যাকরণই যথার্থ বৈজ্ঞানিক ব্যাকরণ।'

সতেরো-আঠারো বছর বয়সে যে-রবীন্দ্রনাথ বাঙলা উচ্চারণের নিয়ম আবিষ্কারের প্রয়াস চালান, সে-রবীন্দ্রনাথ জীবনের চুয়াল্লিশ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার সময় বাঙলায় এক বৈজ্ঞানিক ব্যাকরণের স্বপ্ন দেখেছেন। আর সে ব্যাকরণ হবে বাঙলা উপভাষার তুলনামূলক সূত্রের ব্যাকরণ। রবীন্দ্রনাথ অন্যত্র **বৈজ্ঞানিক ব্যাকরণ** সম্পর্কে বিশেষ কিছু উচ্চবাচ্য করেন নি। "বাঙলা ব্যাকরণের খসড়া" নামের যে রচনাটি পরবর্তী কালে রচিত হয়, তাতে উপভাষায় তুলনামূলক আলোচনা লিপিবদ্ধ হয় নি।

ভাষাতাত্ত্বিক রবীন্দ্রনাথের মূল্যায়ন

ভাষাতাত্ত্বিক হিসাবে রবীন্দ্রনাথ যেসব কাজ করে-ছিলেন, তার মূল্যায়ন হয়েছে। সমকালীন যুগে একাধিক ভাষাবিজ্ঞানী তাঁর ভাষাতাত্ত্বিক রচনাবলীর তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছেন। এঁদের মধ্যে মহম্মদ আবদুল হাই লিখেছেন "ভাষাতাত্ত্বিক রবীন্দ্রনাথ" (১৩৬৮); ওই একই শিরোনামে আর-একটি প্রবন্ধ লিখেছেন ড. কাজী দীন মুহম্মদ (১৯৬৫); সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন "ব্যাকরণিকা রবীন্দ্রনাথ" (১৩৩৩) এবং পবিত্র সরকার লিখেছেন "রবীন্দ্রনাথ ও শব্দবিদ্যা" (১৯৮৫)। আলোচকদের মধ্যে বিভিন্ন যোগ্যতার বিদ্বান আছেন। আবদুল হাই এবং কাজী দীন মুহম্মদ লনডন-ধারার বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানী, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় আরো পূর্বেকার ঐতি-হাসিক-তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞানী, এবং পবিত্র সরকার ট্রান্সফরমেশনাল-জেনারেটিভ ভাষাবিজ্ঞানী। তাঁদের মূল্যায়নের ফলে ভাষাবিজ্ঞানী হিসেবে রবীন্দ্রনাথের প্রেষণা, মৌলিকতা, অন্তর্দৃষ্টি এবং উৎসাহের খবরা-খবর পাওয়া যায়। উপর্যুক্ত চারজন ভাষাবিজ্ঞানীর কেউ রবীন্দ্রনাথের বৈজ্ঞানিক ব্যাকরণ রচনার

আইডিয়ার কথা উল্লেখ করেন নি। এ-ধরনের ব্যাকরণের রূপরেখা কী হবে, এবং এর কোনো বৈদেশিকী মডেল বা প্রতিমান আছে কিনা, সমাজ-ভাষাতাত্ত্বিক দৃষ্টিতে এ-ধরনের ব্যাকরণ সম্ভব কিনা তা আলোচনা করেন নি। এই আইডিয়ার বাস্তবায়ন সম্ভব কিনা তা-ই আমাদের আলোচ্য বিষয়। কারণ এ-ধরনের আইডিয়ায় উদ্‌বুদ্ধ হয়ে অনেকেই শ্রম-নিয়োগ করতে পারেন। তাঁদের শ্রম বৈফল্যে যাক, সেটা কাম্য হতে পারে না।

বৈজ্ঞানিক ব্যাকরণের রূপরেখা

রবীন্দ্রনাথের বৈজ্ঞানিক ব্যাকরণের ধারণা পরীক্ষা করার আগে কোনো বিষয় কোন্ প্রক্রিয়ায় বৈজ্ঞানিকতা লাভ করে তার আলোচনা প্রয়োজন। বিষয়ের বিজ্ঞান হওয়ার অনেক রকম শর্ত আছে। অন্যতম শর্ত হচ্ছে যাচাইকরণ-উপযোগী হওয়া। ইংরাজিতে যাকে ভেরিফায়েবিলিটি বলে উল্লেখ করা হয় তা-ই। অর্থাৎ যে বিষয়ের উপর নির্ভর করে জ্ঞানতত্ত্ব গড়ে ওঠে তার উপাত্তগুলো এমন হওয়া চাই যাতে করে তাদের স্থিতি বা অস্তিত্ব পুনর্নিরীক্ষা করা সম্ভব হয়। রবীন্দ্রনাথ যেসব উপাত্তকে বাঙলার বৈজ্ঞানিক ব্যাকরণের উপাদান বলে অভিহিত করেছেন সেগুলো যাচাইকরণ-উপযোগী কিনা চিন্তা করা যেতে পারে। তাঁর বাক্যটি ব্যবচ্ছেদ করা যাক : **'বাঙলাদেশের ভিন্ন ভিন্ন অংশে' 'যতগুলি উপভাষা প্রচলিত আছে'** তাদের **'তুলনামূলক ব্যাকরণই' 'বৈজ্ঞানিক ব্যাকরণ'**।

বাক্যাংশগুলো তন্নতন্ন করে ব্যাখ্যা করা যাক।

'বাংলাদেশের ভিন্ন ভিন্ন অংশ'

বাঙলা ভাষা যেসব অঞ্চলে প্রচলিত সেগুলোকে অরাজনৈতিকভাবে কিংবা অভৌগোলিকভাবে বিভাজন করা সম্ভব নয়। জর্জ গ্রীয়ারসন ভারতীয় ভাষা জরিপ সংক্রান্ত মহাগ্রন্থে বাঙলা ভাষার উপভাষার নমুনা সংগ্রহ করে দিয়েছেন, কিন্তু গ্রীয়ারসনের ধ্বনিতাত্ত্বিক কিংবা রূপতাত্ত্বিক নমুনা যাঁরাই পুনর্নিরীক্ষা করতে গেছেন তাঁরাই বলেছেন যে তাঁর প্রদত্ত উপাত্ত মোটা-মুটি গ্রহণযোগ্য হলেও ষোলো আনা যথার্থ নয় কিংবা যে শিরোনামে উপভাষাকে চিহ্নিত করেছেন সে শিরোনামের অন্তর্ভুক্ত এলাকা সমরূপ বা এক-রূপসম্পন্ন নয়। তাই সকল ক্ষেত্রে নমুনা প্রতিনিধিত্ব-মূলক হয় নি। অধিকন্তু, যে রাজনৈতিক বিভাজনকে কেন্দ্র করে গ্রীয়ারসন উপভাষা-বিভাজন করেছেন সে রাজনৈতিক বিভাজন এখন ওলোটপালোট হয়ে গেছে। ফলে, উপভাষা বিভাজনের নতুন রাজনৈতিক, সামাজিক কিংবা গণনৈতিক (demographic) পরিস্থিতি পরিবর্তিত হয়ে গেছে। **বাঙলাভাষী সম্প্রদায়** গ্রীয়ারসনের আমলে যে আকৃতির ছিল এখন তা প্রায় তিনগুণ বেড়ে গেছে। বাঙলায় কথা বলে এমন জনগোষ্ঠীর সংখ্যা প্রায় ষোলো কোটি বলে মনে করা হয়। সর্বোপরি ইতিহাসের একটি বৃহৎ মানব-অভিবাসন (migration) ঘটেছে ১৯৪৭-পরবর্তী সময়ে এ অঞ্চলে। তার ফলে সীমান্ত-জেলাতে এবং কেন্দ্রবর্তী নগরে লোকবসতির পূর্বতন ছক বহুল পরিমাণে বদলে গেছে। তাই গ্রীয়ারসনের বিভাজনকে এখন আর যাচাই করা সহজ হবে না। তা ছাড়া, উপভাষার ভৌগোলিক রূপ থাকলেও ভাষার-প্রবহত্ব (continuum) থেকে তাদের সীমান্ত পরিচ্ছিন্ন কঠিন কর্ম। বাঙলাভাষায় কতগুলো উপ-ভাষা আছে, তা যদি বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে নির্ধারণ করা না যায় তবে অনির্ধারিত উপাত্ত থেকে বৈজ্ঞানিক-সূত্র আবিষ্কার করা সম্ভব হবে না। বাঙলা উপভাষা সম্পর্কিত আমাদের জ্ঞান অপূর্ণ। যাও-বা জানি তা বৈজ্ঞানিক নয়, রাজনৈতিক-ভৌগোলিক জ্ঞান থেকে আহরিত রঙিন লেভেল। সে কারণে পূর্বতন উপভাষা-উপাত্তের বৈজ্ঞানিক ভেরিফিকেশন বা যাচাই-

করণের উপায় নেই। বাঙলা বলে যে ভাষাসম্প্রদায়, সে সম্প্রদায়ের ভৌগোলিক বিস্তৃতিকে বৈজ্ঞানিক বিভাজনের প্রক্রিয়ায় ভাষিক জোনে বিভক্ত করে নিতে না পারলে উপভাষাতত্ত্বকে বৈজ্ঞানিক অভিধা সীমিত বা তথাকথিত অর্থেই গ্রহণ করতে হবে। এ-রকম ভাষা জরিপের কাজ রবীন্দ্রনাথের কালেও হয় নি, তার পরেও হয় নি। সুতরাং উপভাষা এলাকা বৈজ্ঞানিকভাবে নির্ধারিত না হলে তার থেকে যেসব উপাদান সংগৃহীত হবে সেগুলো প্রতিনিধিত্বমূলক হবে না।

'যতগুলি উপভাষা প্রচলিত আছে'

ভৌগোলিক উপভাষার পরিসংখ্যান যেমন রাজ-নৈতিক-প্রশাসনিক নামে হলেও আমরা জানি, সামাজিক উপভাষা সম্বন্ধে তাও জানি নে। পশ্চিম বাঙলা আর বাংলাদেশের সমাজস্তরীকরণ করলে কটি বিভাগ পাওয়া যায়? ইউরোপীয় অর্থে সমাজস্তরী-করণ এ অঞ্চলে সম্ভব কি? আর যদি সম্ভব না হয় তা হলে ভাষাসংগঠনের সঙ্গে সমাজস্তরকে সমীকরণ করা সম্ভব হবে কি? পশ্চিম বাঙলার সমাজে বর্ণ-ভেদে ভাষাভেদের অস্তিত্ব আছে কি? বাঙালি অপরাধজগতের ভাষা বাঙলার উপভাষা হিসেবে গণ্য হবে কিনা? অপরাধজগতের উপভাষাকে বাঙলা ভাষার বৈজ্ঞানিক ব্যাকরণের কাঠামোয় সংযুক্তিকরণ সম্ভব হবে কি? এসব প্রশ্নের এখনও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ হয় নি।

দেখা যাচ্ছে, বাঙলার ভৌগোলিক উপভাষা যেমন অধিগম্য হয়ে ওঠে নি, সামাজিক উপভাষাও অধিগম্য হয়ে ওঠে নি। ফলে, তাত্ত্বিকভাবে স্বীকার করা গেলেও একই ব্যাকরণে বাঙলার সকল উপ-ভাষার তুলনামূলক ব্যাকরণসূত্র নির্ধারণ করে নেওয়া বাস্তবতার দিক থেকে সম্ভব হবে না। যুক্তি উত্থাপন করা যেতে পারে যে, একদিনে সম্ভব না হলেও বহু-দিনে সম্ভব হতে পারে। কিন্তু কথা হল, বিভিন্ন যুগে সংগৃহীত উপাত্তের সমকালিক (syncronic) ব্যাকরণ নির্মাণ করলে তা তো তাত্ত্বিকভাবেই অসংগত থেকে যাবে। একই কালে সবগুলো উপভাষা উপাত্ত সংগৃহীত না হলে ভাষারূপ পরিবর্তিত হয়ে যাওয়ার কারণে যাচাই করার সমস্যা উদ্ভীর্ণ হওয়া যাবে না। সুতরাং যে সমাজ সতত পরিবর্তিত হচ্ছে এবং যে ভাষা পরিবর্তিত হচ্ছে, তার **অপরিবর্ত ব্যাকরণ** রচনা করা তাত্ত্বিকভাবে কিংবা উপাত্তগতভাবে সম্ভব নয়।

তা হলে কি রবীন্দ্রনাথের বৈজ্ঞানিক ব্যাকরণের ধারণা স্বপ্নমাত্রই থেকে যাবে, বাস্তবে রূপলাভ করতে পারবে না? হয়তো তাই হবে। নতুন প্রজন্মের কম-পিউটার আবিষ্কৃত না হওয়া পর্যন্ত সংশয় পরিত্যাগ করা যাবে না।

বৈজ্ঞানিক ব্যাকরণের উদ্দেশ্য কী?

কোনো একটি ভাষার কত রকমের ব্যাকরণ হতে পারে তার কোনো সীমাপরিসীমা নেই। একটি ভাষার ইতিহাস-বা ব্যুৎপত্তি-নির্দেশক ব্যাকরণ যেমন হতে পারে, তেমনি হতে পারে তার সমকালীন সামাজিক ব্যাকরণ। একজন মানুষের ভাষার ব্যাকরণ যেমন হতে পারে, তেমনি হতে পারে একটি দলের বা গোষ্ঠীর ভাষার ব্যাকরণ। একটি ভাষার উচ্চারণের ব্যাকরণ যেমন হতে পারে, তেমনি হতে পারে তার লিপির ব্যাকরণ। আবার ছুটোর মিল-গরমিলের ব্যাকরণও হতে পারে।

শিশুশিক্ষার ব্যাকরণ আর বিদেশীদের শেখানোর ব্যাকরণ একরকম হবে না। মানভাষার ব্যাকরণ যেমন হতে পারে, তেমনি হতে পারে অশিষ্ট কথনের ব্যাকরণ। সবগুলো ব্যাকরণই হবে সীমাবদ্ধ ব্যাকরণ। প্রত্যেকটি ব্যাকরণের একটা-না-একটা উদ্দেশ্য থাকে। উদ্দেশ্যহীন ব্যাকরণ আছে কি না কে জানে। উদ্দেশ্য-

মূলক যেসব ব্যাকরণ তাদের কোনোটাকে বলা যায় ঐতিহাসিক ব্যাকরণ, কোনোটাকে বলা যায় বর্ণনা-মূলক ব্যাকরণ, কোনোটাকে শিশুবোধ ব্যাকরণ, কোনোটাকে বিদেশীদের জন্য ব্যাকরণ বলা হয়। একাধিক ব্যাকরণের তুলনা করে যদি রচিত হয় কোনো ব্যাকরণ তবে তাকে তুলনামূলক ব্যাকরণও বলা যাবে, কিন্তু বৈজ্ঞানিক অর্থে বৈজ্ঞানিক ব্যাকরণ কোনো ভাষায় হতে পারে কিনা নিঃসংশয়ে বলা মুশকিল। সুতরাং যাচাইকরণ-যোগ্যতার মাপকাঠিতে রবীন্দ্রনাথের বৈজ্ঞানিক ব্যাকরণ সম্ভবপর না হলেও কিঞ্চিৎ জটিল ব্যাকরণ কিংবা কিঞ্চিৎ পরিব্যাপ্ত ব্যাকরণ যে লেখা যায় না, তা নয়। সে অর্থে রবীন্দ্র-নাথের স্বপ্ন বা ধারণার আংশিক বাস্তবায়ন সম্ভব হতে পারে। অবশ্য ইচ্ছাপূরণের ব্যাকরণের উপযোগিতা কী হবে, সেটা আগেই ভেবে কাজে হাত দেওয়া উচিত বলে মনে করি। কারণ সব ব্যাকরণ একই সঙ্গে নির্মাণ করা দুঃসাধ্য, এবং সে ধরনের ব্যাকরণ যাচাই-করণের অসুবিধার কারণে **'বৈজ্ঞানিক'** হবে না।

অন্ধকার সমুদ্রের ঢেউ

অজিত মুখোপাধ্যায়

মুখবন্ধ

সম্পাদক বললেন, ওদের সম্বন্ধে একটা রিপোর্ট করে দাও, একেবারে সাম্প্রতিক ট্রেনড সহ।

ওদের বলতে সম্পাদক কী বোঝাচ্ছেন, বুঝতে পারছি। ওদের বিষয়ে এ পর্যন্ত অনেক লেখা হয়েছে। গল্প উপন্যাস সংবাদ প্রবন্ধ—বহু। ভেবে পাই না আমি কী নতুন ট্রেনড রিপোর্ট করব।

মনে পড়ে গেল, তর্কের সময় আমার বাল্যবন্ধু সরোজবিহারী গুপ্ত বলত, ওদের তুলে দেওয়া ঠিক না। স্বর্গেও ওরা ছিল, মর্তেও ওরা থাকবে। মানুষের কামনার জ্বালার ক্ষতে মলমের মতোই বল্, অথবা আবর্জনা ফেলার জন্যে ডাসটবিনের মতোই বল্—ওদের প্রয়োজন অনিবার্য!

সরোজের বাড়িতে ছিল আমাদের দৈনন্দিন কালচারাল আড্ডা। সে মেঝেতে বসে, মেঝে চাপড়ে বলত। আরও বলত, অন্য দেশে ওদের রিহ্যাবিলি-টেশন করা হচ্ছে। আমি তার বিপক্ষে। বুঝবে ঠেলা। ওদের এমন সামাজিক প্রয়োজন আছে যে ওরা আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে।

সরোজকে আমি বোঝানোর অনেক চেষ্টা করেছি, কিছুতেই বোঝে নি। সব ব্যাপারেই ও কট্টর প্রাচীনপন্থী।

যাই হোক, সম্পাদক যখন আমাকে ওদের সম্বন্ধে একটা জমপেশ প্রতিবেদন খাড়া করে দিতে বললেন, তখন বারবার সরোজের মুখটা আমার মনে পড়ছিল।

প্রথম কথা বলে রাখি—আমার মন বড়ো নরম। আশৈশব মানুষের কোনো দুঃখ কষ্ট আমার সয় না। ওদের বিষয়ে আমার যতটুকু জানাশোনাদেখা আর পড়া ছিল, তাতে আমি বুঝেছি—ওরা সমাজের একটা অসুখ। এ নিয়ে চা-দোকানে বাড়িতে এবং যত্রতত্র আত্মীয়স্বজনবন্ধুবান্ধব আর তাবৎ-তাবৎ পণ্ডিতদের সঙ্গে তর্ক-বিতর্ক করেছি। কিন্তু শুধু তাত্ত্বিক জ্ঞান দিয়ে তো আর সংসার বা দেশ চলে

না, চাই প্রয়োগজাত জ্ঞান—যার ভিত্তি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা।

শরৎচন্দ্রের চরিত্ররা, যারা ওই, তাদের তিনি দেবীত্বে উন্নীত করেছেন। আমার মনে হয়, সে-কালের পাঠক-পাঠিকাদের কাছে সেটাই দরকার ছিল, তাঁদের মনে আঘাত দেবার জন্যই দরকার ছিল। রমেশচন্দ্র সেনের 'কাজল' উপন্যাসে দেখেছি, কাজলকে মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টা। আর ইয়ামা দি পিট-এর বঙ্গানুবাদ আবার সেদিন পড়লাম, আলেকজানডার কুপরিনের সৃজনীশক্তি ঈর্ষণীয়, ওদের সুখ-দুঃখ আশা-আকাঙ্ক্ষা তিনি গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন—বড়ো হৃদয়গ্রাহী রচনা।

ওদের সন্ধানে

যাই হোক, দুরু-দুরু বক্ষে, সম্পাদক নীলাঙ্কদার স্নেহপূর্ণ আদেশ শিরোধার্য করে, বেশ ক-দিন ঘাসে গেনজি ভিজিয়ে দিয়ে, গোটা শীতকালটা আমি এখানে-সেখানে ঢুঁ মেরে বেড়ালাম।

বড়ো কঠিন কাজ!

যে বাড়িতেই ঢুকি, আশাহত হয়ে বেরোই।

প্রথাসিদ্ধ কৌশলে এক বাড়িতে ঢুকে গিয়ে বসে পড়লাম তক্তপোশে—শীতকালেও তাতে মাদুর পাতা।

এমনভাবে গুছিয়ে বসলাম, যেন এসব আমার খুবই পরিচিত। ফশ করে সিগ্রেট ধরিয়ে ঘন-ঘন টান দিতে লাগলাম একজন মাব্বতরের মতো। বললাম: দেখো, আমি কিন্তু সে ছেলে নই, আমি কিন্তু এসেচি অন্য এক কাজে।

মাঝবয়সী মেয়েটি, ইতিমধ্যেই তার শরীরে জরা দেখা দিয়েছে, রঙটি কালোর দিকেই, পরনে খাটো শায়া এবং উঁচু করে পরা শাড়ি। তার শরীরের কোথাও আর রমণীয়তা বা কমনীয়তা নেই। কণ্ঠ-স্বরেও না।

গা ঘিনঘিন করতে লাগল। রাশি-রাশি সিগ্রেটের সুগন্ধি ধোঁয়া ছড়িয়ে ঘরটিকে ঘৃণামুক্ত করার চেষ্টা করলাম।

আমার দিকে এমনভাবে তাকাল মেয়েটি যেন আমি চুরি-টুরি করতে এসেছি। অথবা এমন ছেলে সে জীবনে দেখে নি।

কী কাজ? —নিস্পৃহ কণ্ঠে বললে মেয়েটি।

গলা শুকিয়ে গিয়েছিল। মুখে থুথু এনে ভিজিয়ে ঠোঁট দুটি চেটে সিগ্রেটে টান দিতে লাগলাম। প্রথমেই স্ত্রীলোকটিকে দশ টাকা দিয়েছি। জানি এই প্রতিবেদন লেখার জন্য কিছু ইনভেসটমেনট আছেই। ভাবি, ইনভেসটমেনটটা বাজে খরচ হবে না তো?

বললাম: এই, তোমার সম্বন্ধে জানা। মানে তোমার সম্বন্ধে জানতে এসেচি। কোথায় ছিলে, কী করে এ লাইনে এলে, এখানে কেমন লাগে—এইসব আর কী?

অ! খবরের কাগজের লোক?

আশ্বস্ত হলাম। নিশ্চয় আগে কেউ এসেছে, জানে কোনো অসুবিধে হবে না। পকেট থেকে ক-শিট ভাঁজকরা কাগজ, আর বুকপকেট থেকে কলমটা বাগিয়ে ধরে উন্মুখ হয়ে থাকি—প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ, প্রতিটি শব্দ আমি ধরে রাখব।

বলো—বাবা কী করে বা করত? ঠিক-ঠিক নাম বলার দরকার নেই—মিথ্যে বললেও চলবে। আসল কথা হল সঠিক বিষয়টা জানা। —খুবই অন্তরঙ্গ সুরে কথা বলি, যাতে সে তার মনের কথা উজাড় করে দিতে পারে সহজে।

দু-চক্ষে দেখতে পারি না।—মেয়েটি বললে চোখ-মুখ ঘুরিয়ে। কী? কাকে?

এই তুমাদের মতো লোকদের। কাজের সময় তামাশা ভালো লাগে না বাপু!

তামাশা?

নাকি রঙ্গ বলব? অই তামাশাও যা, রঙ্গও তাই। এখন মানে-মানে কেটে পড়ো দিকি!

তোমাদের কথা দেশের মানুষের কাছে জানাতে চাও না?

কী লাভ? কী লাভ বলো? —তেড়ে-মেরে খেঁকিয়ে উঠল মেয়েটি।

বললাম: কোনো লাভ নেই? মানুষে জানবে, মানুষে ভাববে তোমাদের সম্বন্ধে। তোমরা তো অনেক—অনেক কষ্টে আছ এখানে।

যাও যাও। বেশি বকিও না। যাও—

মেয়েটির মুখমণ্ডলে প্রথম দিককার আগ্রহের ঘনত্ব উপে গিয়ে স্পষ্ট অনাগ্রহের ঝাঁঝ বেরিয়ে আসছে।

বিপন্ন মানুষ যেমন তার সব কথা দ্রুত আর এলোমেলো বলে যায়, তার না-থাকে ভাষার বাঁধুনি বা ব্যাকরণ বা স্পষ্ট উচ্চারণ, তেমনি আমি বলে গেলাম কতগুলি বাক্য, তাদের মর্মার্থ—তোমার তো কোনো অসুবিধে হবে না, ক্ষতি হবে না। তবে তোমার বলতে কী আপত্তি?

আমাদের ভালো তুমি কত্তে পারবে না, আমাদের ভালো কেউ কত্তে পারবে না—এখন তুমি যাও দিকি, বাপু!

দুর্ভেদ্য খোলশের মধ্যে স্ত্রীলোকটির মন সামান্য স্পর্শ করতে পারলাম না।

দশ-দশটি টাকা গচ্চা দিয়ে বাইরে এলাম। মন হতাশায় ভারি হয়ে গেছে। ঘরের ভেতরে ঘেমে গেছলাম, বাইরে যেন শীত জাঁকিয়ে ধরল।

ভাবলাম সম্পাদককে গিয়ে আজকেই বলব: এ সাবজেকট বাদ দিন নীলাঙ্কদা—অন্য কিছু দিন।

ফ্যানের তলায় একগুচ্ছ ফাইলের মাঝখানে নীলাঙ্কদা চোখ বন্ধ করে চিন্তায় নিমগ্ন।

চেয়ার টেনে বসার শব্দে চোখ খুলে বললেন: হয়ে গেছে?

অভিজ্ঞতার বিস্বাদ উজাড় করে দেবার মধ্যপথে নীলাঙ্কদা বললেন: আরে, সে তো হবেই। যাও যাও, চেষ্টা করো। এত অল্পে ভেঙে পড়লে চলে?

নীলাঙ্কদা···

নো নো। কোনো কথা নয় বিশ্বাস! বিশ্বাস, তুমি বিশ্বাস হারাচ্চ?

এজন্যে নীলাঙ্কদাকে ভালো লাগে, ইয়ং জেনা-রেশনকে উদ্‌বুদ্ধ করতে ওঁর জুড়ি নেই।

তোমার নাম উজ্জ্বল বিশ্বাস—ছুটি শব্দেই এত পোটেনশিয়ালিটি—আর···

আর কিছু বলার নেই। কিন্তু মুখে রাজ্যের মেঘ সঞ্চিত করে আবার মনের যন্ত্রে দম দিতে-দিতে বেরিয়ে এলাম। আবার সেইসব গলির পর গলি—মাইলের পর মাইল, ব্যর্থতার পর ব্যর্থতার ভার মাথায় বয়ে হেঁটে যাই নিশিপাওয়া মানুষের মতো। একটা জুতসই ঘর বা মেয়ে চোখে পড়ে না।

দিন পাঁচেক বাদে, বিকেল-বিকেল সর্পাকৃতি গলিটার এক বাঁকে একজনের সঙ্গে দ্রুত পায়ে তার ঘরে ঢুকে পড়ি!

দরজায় খিল তুলে দিয়ে আধঘটা মেঝেতে সে একটি মাদুর পেতে দেয় এবং পেছন ফেরে।

কণ্ঠে আমি শক্তি সঞ্চয় করে বলি: শোনো শোনো। আমি কিন্তু অন্য ব্যাপারে এসেচি।

মেয়েটির বয়স কম, বড়োজোর চব্বিশ-পঁচিশ, রঙ ফরসা, চাপা নাক, মুখে এখনো সরলতার অবশেষ। সে থতমত খেয়ে ঘুরে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে।

ওকে ইশারায় ডেকে মাদুরের একপাশে বসার ইঙ্গিত করি।

এতক্ষণ সপ্রতিভ মেয়েটি জবুথবু হয়ে বসে মাদুরের এক ধারে।

আমি বলে চলি: শোনো, আমি খবরের কাগজের লোক—মানে রিপোর্টার—মানে সংবাদদাতা বা লেখক, যা-ইচ্ছে বলতে পার।

হাঁ করে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে মেয়েটি।

তোমাকে কিছু জিগ্যেস করব। সত্যি বলবে, কোনো ভয় নেই। বুঝলে? সত্যি কথা বলবে।

কী—কী কথা? মেয়েটির ছুটি ঠোঁট নড়ে ওঠে, কিন্তু নিষ্প্রাণ।

ওকে দেখে মনে হয়, ইতিমধ্যে সে কিছুটা রপ্ত হয়ে উঠেছে। তবে এ অঞ্চলে সচরাচর যা হয়, প্রায় সবাই অর্ধশিক্ষিত বা অশিক্ষিত। মেয়েটি তাদের চেয়ে উন্নত নয়।

তোমার জীবনের ইতিহাস বলবে ছোট্ট করে? আমি কাউকে বলব না; আর যা লিখব তাতে তোমার নাম-টাম থাকবে না।

মেয়েটি নিরুত্তর। আবার আমি দিশেহারা হয়ে পড়ি।

ওর সেনটিমেনটে আঘাত দেবার জন্য বলি: তোমরা এখানে তো খুব কষ্টে থাক, না?

কষ্ট?—মেয়েটি এবারে প্রায়-হাসির মতো ভাব করল মুখে।

নড়েচড়ে বসে আমি সাগ্রহে বললাম: হ্যাঁ, কষ্ট। কেমন কষ্ট—কী অসুবিধায় পড়ে এখানে এলে, এখানে কারা কষ্ট দেয়, কেমন লাগে এখানে,—এইসব আর কী!

এবারে মেয়েটি দাঁড়িয়ে পড়ল, কী ভাবল ক-মুহূর্ত, তার পর এগিয়ে গিয়ে দরজায় কান পেতে রইল কিছুক্ষণ, ফিরে এসে বসল যথাস্থানে। কিন্তু চুপচাপ।

ভয় করচে? বলতে ভয় করচে?

হ্যাঁ।

তুমি কিছু বলতে চাও?

আবেগে আমার কণ্ঠস্বর গাঢ় হয়ে এল। সামনে যে বসে আছে, তার সম্পর্কে ধারণানুযায়ী একরাশ যন্ত্রণার রূপ এবং ইতিহাস, মনে-মনে রচে নেওয়া সহজ। মানুষ কত কীই না বলে। বাল্যবন্ধু সরোজ বলত: আরে শোন্, পদস্খলনটাই বেশি—স্বভাবের জন্যই বেশি—অভাবে যে একেবারে হয় না, অবশ্য সে কথা বলতে পারি না।

অবশ্য আমার মনে হয় অন্য—যাক গে, এখানে আমার কথা থাক।

আবার ওকে বললাম: বলো না, বলো। আমি কাউকে বলব না, বিশ্বাস করো—আর তোমার কথা এখানে কাউকে বলে দিয়ে আমার কী লাভ?

ও ফিশফিশ করে বলল: বলা মুশকিল—দেয়ালের ওধারেই মানুষ—

আমার শরীর শিরশির করে উঠল। কোথায় এলাম? যখন অন্য কোথাও হয়তো শান্তি, তখন এসব অঞ্চলে নোংরামি মারধোর খুনোখুনি লেগেই থাকে। এ অঞ্চল নিয়ে যে যাই লিখে থাকুন, আমার তো বমি পায়, গলিতে পা দিলেই। আবার ভাবি, এরাও তো মানুষ, আমাদের মতোই রক্তমাংসের মানুষ। ওদেরও তো আমাদেরই মতো আনন্দ সুখ, ভালো-ভাবে বাঁচা ইত্যাদি সবরকমের চাহিদাই আছে। ওরাও তো আসছে যার-যেমন-ক্ষমতা তার তেমন সাজানো-গোছানো সংসার থেকেই!

বলো, বলো, যা মনে আসে বলো।—সোৎসাহে আমি বলে উঠি।

নীলাঙ্কদার প্রেরণা মনে-মনে ভেসে ওঠে, ট্রাই ট্রাই ট্রাই এগেন, অ্যানড ইয়ু উইল সাকসীড অ্যাট লাস্ট—

বলার কুন উপায় নাই।—বেদম পুতুলের মতো মেয়েটি দরজার দিকে তাকিয়ে আবার অনড় হয়ে গেল, তারপর কোনোরকমে জোর করে উঠে দাঁড়াল।

কোনো বোবাকালার যদি নিদারুণ শারীরিক কিংবা মানসিক যন্ত্রণা হয়, তবে তার মুখে যেমন অভিব্যক্তি, তেমনি মেয়েটির মুখেও।

ধীরে-ধীরে সে আবার বসল মাদুরের কোণে, বললে, ছাড়ান দাও, আমার কতা শুনতে গেলে রাত ভোর হয়ে যাবে।

এমন সুযোগ কেউ ছাড়ে? হাতছাড়া করে? হাতের নাগালেই আমার অভিপ্রেত। আর সে পর-

মুহূর্তে হারিয়ে যাবার অপেক্ষায়—এমন চিন্তায় আমি নিজেও বোবাকালা হবার কাছাকাছি—

জড়তা ভেঙে বললাম: আজ যতটুকু পার বলো। আবার আমি আসব। এটা আমার চাকরি, সত্য তুলে ধরার চাকরি মানুষের কাছে।

যদি জানতে পারে, তাহলে তোমার আমার কারও রক্ষে রাখবে না আজ তুমি এসো বরন্…

এবারে মেয়েটি উঠে পড়ল, আর সেই সময় এক বয়স্কা মহিলার ভাঙা কণ্ঠের আওয়াজ: অ্যাই ফুলু—কৎখন লাগে লো?

মেয়েটি নিম্নকণ্ঠে বলল: অই শুনচো?

আমি বলি: কাকে, কাকে তোমার ভয়?

কাকে নয়?

তারা কারা?

যারা আচে মাতার উপ্‌রে।

আন্দাজে তাদের নাম করলাম, যে চক্র এদের চালাচ্ছে—একে-একে তাদের নাম, তখন আমিও উঠে দাঁড়িয়ে আর-একটি নতুন সিগ্রেট ধরিয়েছি।

আমার চোখে পূর্ণ দৃষ্টি রেখে মেয়েটি বললে: তেবে তো তুমি সবই জান।

কিন্তু তোমার ইতিহাসটা তো—

তখন নেপথ্যে আবার সেই ভাঙা কণ্ঠস্বর—এবারে আরও তীক্ষ্ণ, আরও কর্কশ!

আবার আসব?

সে তোমার ইচ্ছে—

বিশেষ কিছুই জানা গেল না। আর নতুন করে জানবারই বা কী আছে?

কী লিখব ভাবতে-ভাবতে ক-দিন রাত্রে ঘুম নেই।

নীলাঙ্কদার কাছে সারেনডার করব ভাবছি, আর সেই না-হেরে যাবার ঝোঁক মনে-মনে সৃজন করে চলেছি।

কাঁছনিকে পেলাম, সত্যিই কি পেলাম?

একদিন বিকেল-বিকেল নতুন একটি গলি দিয়ে যাচ্ছি। সন্ধেবেলায় দরজায়-দরজায় এমন ঝাঁক-ঝাঁক ভিড় যে জেনে ফেলেছি, সে-সময় আমার উদ্দেশ্য সাধিত হবে না। আর সে-সময় ওরাও থাকে পয়সা রোজগারের গাঢ় চিন্তায়। তখন তারা এক মিনিট সময় নষ্ট করতে রাজি নয়।

বড়দা—বড়দা—

কে যে কাকে ডাকে প্রথমে বুঝতে পারি না। ছিলাম নিজের ব্যর্থতার ঘোরে।

আবার কে ডাকে: বড়দা—বড়দা—

এই চওড়া গলিটার সঙ্গে ছ-ধারের চাপ-চাপ বাড়ির যে সরু-সরু গলি মাঝে-মাঝে মিশেছে, দেখি, তারই একটিতে ঠেশ দিয়ে দাঁড়িয়ে একটি মেয়ে। তাকে কোথাও যেন দেখেছি, সেই মুহূর্তে সঠিক চিনতে পারছি না।

পায়ে-পায়ে ওর কাছে এগিয়ে গেলাম।

সে কী গ? চিনতে পারচ নি?

মেয়েটি পান চিবুচ্ছে, এবং বাঁ হাতে পানের বোঁটা থেকে ডান হাতের তর্জনী দিয়ে সামান্য-সামান্য চুন নিয়ে জিভে ঠেকাচ্ছে।

কাঁছনি, তু-তুই?

হঁ গ, থালে চিনতে পাল্লে?

হ্যাঁ পেরেছি। ওর ভালো নাম ক্রন্দন, মুখে-মুখে সে-নাম দাঁড়িয়েছিল 'কোনদল', তারপর কখন কার মুখে 'কাঁছনি' হয়েছিল, কেউ বলতে পারবে না।

ওকে এখন এখানে তুই বলা শোভা পায় কি না, ভাবছিলাম। কখনো ওকে তুমি-টুমি বলি নি, তুমি বলতেও মুখে আটকাচ্ছিল। সে যাই হোক, কাঁছনিকে এখানে দেখে যেমন সীমাহীন বিস্মিত হয়েছি, তেমনি আমার বুকে মৃতপ্রায় আশার আলোটাও দপ করে জ্বলে উঠল।

একদিকে আমার বুকে সাইক্লোন, অন্য দিকে ওর

কাছ থেকে অনেক কিছু পেতে পারি বলে অদ্ভুত উল্লাস।

কাঁদুনি বলছে : কুথায় চলেচ এ দিকে ?

এই—এই কাজে। মানে—তোমার ঘর কোথায় ?

এক পলকে ধরেই নিয়েছি, কাঁদুনির বর্তমান পরিণতি।

এসো না বড়দা, আসবেক ?—ওর প্রশ্নে দোদুল্যমান সশঙ্ক ভাব : এসো এসো। এসো !

কাঁদুনির কণ্ঠে যে ব্যাকুল অনুরোধ তার প্রয়োজন আমার কাছে ছিল না। সে তো জানে না কেন আমি এ-রাস্তায় হাঁটছি। মুহূর্তের মধ্যেই ঘরের জঙ্গল পার হয়ে ভেতর দিকে একটা খুবই ছোট্ট ঘরে ঢুকলাম কাঁদুনির পিছু-পিছু।

কাঁদুনি পরে ছিল সালোয়ার কামিজ—ওর মুখে গ্রাম্য ভাষার সঙ্গে সেই পোশাক বড়োই বেমানান লাগছিল।

চা খাবে ত ?

না রে—

কুন চিন্তা নাই, কাপ ডিশ তুলা আছে। ভাই আসে ত। বসো, বসো।

পাতলা তোশকের ওপর রঙচঙে হ্যানডলুমের চাদর পাতা, সিঙ্গল বেড, এক কাঁঠাল কাঠের তক্তাপোশে বসতে-বসতে বললাম : ভাই ? মানে ? হরগোবিন্দ ?

হঁ গ।

সে আসে ?

আসে। মাজে-মাজে টাকা লিতে আসে।

কী বলব, কোন্‌খান থেকে শুরু করব, কী ভাবে জানব, ইত্যাদি প্রশ্নাবলীতে আমার বুকের ভেতরে তখন ঝড় বইছিল। যে কাঁদুনিকে আমি চিনতাম, মনে হচ্ছে তার একতিল অবশিষ্ট নেই। আর তার পুরনো আর নতুন জীবনে এত অমিল যে, বর্তমান জীবন দেখে—এই ক-মিনিট দেখে তার অতীতটাও যেন বোঝা অসম্ভব। অথচ আমি তো ওকে চিনি, জানি। অতীতটার সঙ্গে বর্তমানটাকে যেন কিছুতেই মেলাতে পারছি না। সব-কিছুই আমার কাছে গুলিয়ে যাচ্ছে।

কাঁদুনিকে দেখে কতগুলি ছবি এবং কিছু-কিছু বিক্ষিপ্ত ইতিহাস মনে পড়ে গেল : চিকুরবনি গ্রামের সনাতন মল্লিকের মেয়ে। পশ্চিমবাঙলার দরিদ্রতম গ্রামগুলির একটি চিকুরবনি, আর চিকুরবনির দরিদ্রতম মানুষগুলির একজন সনাতন। ওকে প্রথম দেখার ছবিটা মনে-মনে ভেসে ওঠে।

কখনোই আমি একটানা গ্রামে বাস করি নি। বাবা মারা যাবার পরে গ্রামে গেছি মাঝে-মাঝে মাকে সাহায্য করতে, ধানধুন আদায় করতে। মনে আছে এক শীতের সকালে, যখন লেপের তলা থেকে আমরা বাইরে বেরোতে পারি না, তখন সনাতন এসে পড়েছে জ্যেঠামশায়ের বাড়ির কাজে—সারা দিনের মুনিষের কাজ।

মাটির উঠোনে খাটিয়াতে বসে-বসে আমি রোদ পোয়াচ্ছিলাম, সনাতন এল—পাঁচ ফুট ছ ইনচি লম্বা, কাঁচা সোনার মতো গায়ের রঙ, রোদে পুড়ে জলে ভিজে ইঁটের মতো হয়ে গেছে, রোগা-রোগা চেহারা, মাথায় বিরল চুল, কিন্তু একটিও পাকে নি। খুবই স্বল্পবাক। কাজের কথা ভিন্ন কিছুই বলে না। নিরীহ গোবেচারা বোকা সরল—সবকিছুই বলা যায় ওকে।

আমি বললাম : জামা পরে আস নি কেন সনাতনকাকা ?

পরনে ওর হাঁটুর ওপর আটহাতি ধুতি, আর গায়ে একটি ছোট্ট গামছা জড়ানো।

পাশ থেকে বিধবা কাকিমা বলে উঠল : চুপ কর্‌···চুপ কর্‌···

পরে জেনেছিলাম, গ্রামের গরিবদের শীতবস্ত্র প্রায় থাকেই না···সুতরাং তখন জামা পরার কথা জিগ্যেস করার অর্থ ওদের খোঁচা দেওয়া বা অসম্মান করা।

রূপ আর সনাতন দু-ভাই—যমজ, দুজনেই

সদ্‌গোপ, দুজনেরই জমিজমা কিছু ছিল না—দুজনেই খেতমজুরি করে সংসার চালাত।

কাঁদুনি সেই সনাতনের বড়ো মেয়ে। দেখতে-দেখতে কাঁদুনি হয়ে উঠেছিল ওর মায়ের মতো দীর্ঘকায়, আর তেমনি দেহের হাড়গুলি মোটা-মোটা। পরে আমাদের বাড়ি ঝিয়ের কাজ করে, তার স্বাস্থ্য হয়ে উঠেছিল মারাত্মক।

ইতিমধ্যে কাঁদুনি একটা ঝকঝকে ডিশে খান আষ্টেক ব্রিটানিয়া বিসকুট আর একজোড়া তেমনি পরিষ্কার কাপ-ডিশে চা এনে রাখল বিছানায়। হাসবার চেষ্টা করল—সে হাসি কী যে মর্মান্তিক, বলে বোঝাতে পারব না।

ওর দিকে যতই দেখি, ততই আমার মনে ভাবান্তরের নানান বর্ণের ছটা খেলে যায়। ওর চেহারায় কথায়-বার্তায় অনেক পরিবর্তন হয়েছে। আমি অনেকদিন গ্রামছাড়া। ওকে দেখেই আমার মনে পড়ে যাচ্ছিল সেই চিকুরবনি গ্রাম—লাল মাটির সেই গ্রাম—যাকে ঘিরে আছে উঁচু-নীচু মাঠ, যার বুক চিরে চলে গেছে আধ-হাত জলের চিরপ্রবহমান চম্পাবতী খালের স্রোত, যার পুবে আর পশ্চিমে মাইলের পর মাইল শাল জঙ্গল, যে গ্রামে হাজার হাজার কৃষক পরিশ্রম করে ; যে গ্রামের মাটিতে-মাটিতে বিভিন্ন ঋতুতে নানান বর্ণে ফলে ওঠে জীবন-দায়ী ফসল ; যে গ্রামে মাত্র তিনটি পুকুর আছে, যে গ্রাম বাঙলাদেশের প্রতীক !

কাঁদুনি যেন চিকুরবনি গ্রাম হয়ে আমার সামনে দাঁড়িয়ে !

কাঁদুনি আমার কে ? তবে আমার গলায় কেন কান্না ঠেলে আসছিল ?

সনাতনের মেয়ে কাঁদুনি আমাদের গ্রামের বাড়িতে অনেক দিন ঝিয়ের কাজ করেছে। যখনই বাড়ি গেছি, তখনই দেখেছি ওকে। সারা দিন প্রায় মুখ বুঁজে কাজ করে যাচ্ছে স্ত্রী-দৈত্যের মতো একটি মেয়ে—বাসন মাজা, গোটা বাড়ি আর উঠোন ঝাঁট দেওয়া—সেগুলি লাতা দেওয়া, মশলা বাটা, কাপড় কাচা, ইঁদারা থেকে বালতি-বালতি জল তোলা, চম্পাবতী খালের বালিতে চুয়া কেটে খাবার জল বয়ে আনা দিনে বড়ো-বড়ো চার-পাঁচ ঘড়া। অগুনতি কাজ। সকালে কাজে আসত, ফিরত সন্ধেয়। বাড়িতে বাড়তি আত্মীয়-স্বজন এলে তার কাজের চাপ অনেক বেড়ে যেত—তখন রাত্তিরেও থাকতে হত।

অথচ বাড়ির গিন্নি এবং তার মেয়ের কাছে কেউ কোনো কালে কাঁদুনির প্রশংসা শোনে নি। সে নাকি কত বাসন ভেঙেছে, কত জিনিস হারিয়েছে। সে নাকি খুবই ঢিলা। আর খায় নাকি চার-পাঁচ জন মানুষের সমান। রক্ষে করো মা, মেয়েমানুষের অমন রাক্ষুসে আহার ! রক্ষে করো !

বাড়িতে কিছু একটা বিপদ ঘটলেই, তার সঙ্গে কাঁদুনিকে জড়িয়ে দিয়ে বলা হত, হবে না ? যে-বাড়িতে কাঁদুনি আছে, সে বাড়িতে—

আমি খুব কাছ থেকে ওকে দেখেছি, এবং মনে হয় চিনেওছি। বড়ো হয়ে, বুদ্ধি-বিবেচনা হয়ে এ-টুকু বুঝেছি—সত্য বড়ো নির্মম···বাড়ির লোক, আপন জন, বন্ধু-বান্ধব—সবকিছুর ঊর্ধ্বে সত্য !

সেজন্য কাঁদুনিকে আড়ালে প্রশ্ন করতাম : এরা লোক কেমন রে ? ও হাসত।

অনেক দিনের অন্তরঙ্গ ব্যবহারে ওর মন কাড়তে পারার পরে সে বলত, কে কেমন ?

এই মেয়ে যখন কোনো বিশেষ প্রয়োজনে বা অসুবিধায় কামাই করত (অবশ্য কামাই তার বছরে সামান্য ক-দিন), তবে বাড়ির মেয়েরা কাঁদুনিকে ছিঁড়ে খেয়ে ফেলতে পারলে বেঁচে যেত—আর বলত : ভাত ফেললে আবার কাকের অভাব, ভাত ফেললে আবার কাকের অভাব···এই বাক্যটা সেদিন সারাদিন বাড়িতে ফিরে-ফিরে আসত।

আমি কাঁদুনিকে বলতাম : এত গালাগাল দিচ্ছে, তুই কিছু বলতে পারিস না ?

অদের কষ্ট হয় যে !

চমৎকার! ওদের কষ্টের জন্য কাঁহুনি চিন্তিত—খুবই চিন্তিত।

কাঁহুনিকে নিয়ে এ-রকম ছোটোখাটো তুচ্ছ অজস্র উপাখ্যান আছে—সে আর কে কত মনে রেখেছে। চিকুরবনিতে কাঁহুনি ছিল প্রখ্যাত, দুট কারণে। এক, সে কাজ করত অতুলনীয়, এবং দুই, তার বিশাল শরীর মেদহীন, আর সরল মন ভাঁজহীন! এই দুটি কারণে গ্রামের যুবকরা বা বদমাশ জমিদাররা কাঁহুনিকে রাত্রে অবশ্যই স্বপ্ন দেখেছে।

এই অতিসাধারণ কিংবা অসাধারণ মেয়েটির বিয়ের সম্বন্ধ নিয়ে আসে কালীপদ ঘটক, বেঁটেখাটো বয়স্ক কৃষক—বিয়ের সম্বন্ধ করতে গিয়ে ভালোমন্দ আহার এবং কিছু নগদ টাকা পাওয়া যায় বলে এই ঘটকালি করে অবসর সময়ে। লোকটির মুখে হাসি সর্বদাই। সে বিয়ের পাত্র সম্পর্কে বলে—রাজার মতন, আর পাত্রী সম্বন্ধে বলে—অমন পাত্রী পাওয়া ভার! বিয়ে হয়ে যাবার পরে যে দু পক্ষের কাছ থেকেই গালাগাল শুনতে হয়, এ-অভিজ্ঞতা তার অনেকদিন আগেই হয়ে গেছে।

গ্রামাঞ্চলে পণপ্রথা ক্রমাগত নীচের তলাতেও ছড়িয়ে পড়ছে—মানে কন্যাপণের কথা বলছি। আর সদ্‌গোপরা তো গেরস্তঘর—গ্রাম্য বর্ণবিন্যাসে তারা বাযুন কায়েত ক্ষত্রিয়দের পরেই। তাই সদ্‌গোপদের ছেলেরা পণের দাবি করছে ইদানীং···আর শিক্ষিত হলে তো কথাই নেই।

সনাতন মল্লিক নিঃসম্বল মানুষ—মেয়ে বড়ো হচ্ছে, পণ-টন দেবে কী করে? আর দিনকে-দিন কাঁহুনি যা শালগাছের মতো বেড়ে চলেছে! ইদানীং আবার মাঝরাত্রে সনাতনের আগলে ইঙ্গিতপূর্ণ ধাক্কা দেবার শব্দ! সনাতন আর তার বউ বাকি রাত জেগে বসে থাকে—একটি বিড়ি তিনবার খেয়ে টান দিতে-দিতে ভোর করে সনাতন।

কালীপদ ঘটকের সঙ্গে মাঠে-রাস্তায় আশুথ-গাছতলায়, সনাতনের একান্ত আলাপ পাঁচজনে দেখতে পায়।

একদিন কয়েকজন অবাঙালি আসে কালাপদর সঙ্গে, পাত্রী দেখে।

অবাঙালিদের পরনে দামি ফুলপ্যান্ট তার ওপর কলার-উঁচু কলিদার পানজাবি, পায়ে নাগরা। ওরা ট্রাক-মালিক বলে পরিচয় দেয়। এক যুবককে দেখিয়ে বলে, এর জন্য পাত্রী চাই। আরও বলে, তারা তো ঘুরে বেড়ায় ট্রাক নিয়ে চারও তরফ, ইস লিয়ে উধারকা লেড়কি লোগ সাদি করনা নেহি মাঙতি। আউর বাংগালকা লেড়কি বহত আচ্ছি হ্যায়। বহত খাপসুরত হ্যায়। বাংগালকা লেড়কি হামলোগোঁকা বহত হি পসন্দ!

এসব যখন ঘটছিল, তখন আমি গ্রামে ছিলাম না। যখন কাঁহুনির সঙ্গে ওই ট্রাক-মালিকের বিয়ে হয়ে গেল, তার কিছুদিন বাদে বাড়ি গিয়ে সব শুনেছিলাম।

আশ্চর্য, ওদের খরচের বহরে পাত্রীপক্ষের কেউই যাচাই করে দেখে আসে নি বরের বাড়ির ঠিকানাতে।

আস্তে-আস্তে প্রকাশ পেয়ে গেল, কাঁহুনিকে মিথ্যে বিয়ে করে নিয়ে গেছে। আর ক্রমশ আরও জানাজানি হল, এই একই ভাবে অন্যান্য গ্রাম থেকেও ভালো-ভালো যুবতীদের বিয়ে করে নিয়ে যাচ্ছে একটা বা কয়েকটা মেয়ে-বাবসায়ীর চক্র; বাঙলার বাইরে মোটা টাকায় মেয়েদের দিচ্ছে বিক্রি করে।

কাঁহুনির মা কিছুদিন উচ্চৈঃস্বরে কালীপদ ঘটকের চোদ্দপুরুষ উদ্ধার করে দিয়ে কাঁদতে-কাঁদতে ক্লান্ত হয়ে পড়ল। সনাতনরা এতই গরিব, তারা থানা-পুলিশের ছায়াও মাড়াল না। কাঁহুনি বলে যে একটি মেয়ে ছিল, গ্রামের লোকেরা আস্তে-আস্তে ভুলে গেল। কোথাও আবার কোনো মেয়ের এমন বিয়ে হলে, তখন কাঁহুনির প্রসঙ্গ ওঠে। সনাতন যেমন পাথর তেমনি পাথরই থাকে।

পাঁচজনে কিন্তু সনাতনকে ছেড়ে কথা কয় না। বলে: লোজ্জা করে নি, বাপ হয়ে পাঁচশো টাকার

লোভ!

সনাতনকে আমি দোষ দিতে পারি না। সে কি ভাবতে পেরেছিল এমন অঘটন ঘটবে। কেউই কি ভাবতে পেরেছিল। যদি পেরেই ছিল তখন তারা বলে নি কেন?

এখন কাঁহুনি, যে চিকুরবনি গ্রামের মানুষের কাছে হারিয়ে গেছল, সে আমার সামনে।

দু-চারটি ছিটছাট এটা-সেটা বেথাপ্পা কথাবার্তার পরে, ওকে আমার এ-পাড়ায় ঘোরাঘুরি করার উদ্দেশ্য খোলাখুলি বললাম, চা-বিসকুট খেতে-খেতে।

তখনও তাকে দেখতে-দেখতে আমার ভাবনার ঘোর পুরোপুরি কাটেনি। ও যখন এটা-সেটা কাজে আমার গা-ঘেঁষে চলাফেরা করছিল, তখনও ওর শরীরে খুঁজছিলাম মাটির গন্ধ। হ্যাঁ, টের পাচ্ছিলাম আস্তে-আস্তে, ওর যে পরিবর্তন হয়েছে তার অনেকটাই বাইরের, অন্তরের দিকটায় এখনও বেঁচে রয়েছে সেই গ্রাম্য সত্তা। মাঝে-মাঝে মনে হচ্ছিল ওর শরীরে এখনও মাটির গন্ধ। চোখ বন্ধ করে দেখলে ওর আজানুলম্বিত কেশরাশিতে গ্রাম্য রাত্রির অন্ধকার আকাশ, আর ওর চোখে গ্রাম্য রাত্রির নক্ষত্রের রোশনাই, হাসিতে এমন সরলতা, যা ভারতের যে কোনো গ্রামে অজস্র কাঁহুনির মধ্যে দেখতে পাওয়া যাবে।

আমি কি বিহ্বল হয়ে পড়েছি কাঁহুনিকে দেখে?

না কি আমার রিপোর্টের সম্ভাব্য সুযোগ দেখতে পেয়ে ভীষণ রোমানটিক হয়ে উঠেছি?

না কি কাঁহুনিকে দেখে আমার চিন্তার জগৎ এমন আলোড়িত, যা নয় তাও ভেবে চলেছি।

গ্রামের কে কেমন আছে, ও প্রশ্ন করে যাচ্ছে, আর উত্তরে বেশির-ভাগ ক্ষেত্রেই, না, বা জানি না বলছি—অথবা বলছি, যতটুকু জানি ততটুকুই—আর, সব শোনা কথাই।

এই কথাবার্তার মধ্যেই এক বিশালকায় বয়স্কা মহিলা দরজার চৌকাঠে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল: এ কে লো ছুঁড়ি?

কাঁহুনি বলে: দেশপাড়াগাঁয়ের লোক।

হস্তিনীর মতো থপথপ করতে-করতে থমথমে মুখে চলে গেল মহিলা।

জিজ্ঞেস করলাম: কে? মাসি?

হুঁ।

আর-একজন এসে দাঁড়াল ক-মিনিট বাদে। দীর্ঘকায় চিমসে চেহারা, চোঙা প্যানট, বনজঙ্গল-আঁকা নানা বর্ণের বুকখোলা হাওয়াই শার্ট, গলায় সরু চেনে একটি লকেট ঝুলছে—রাধাকৃষ্ণ অথবা সেন্ট মেরীর, কানঢাকা কাঁধ পর্যন্ত রুক্ষ চুল, পায়ে ফোমের চটি, ডান হাতে বালা। চোখ দুটি কৈদফলের মতো ঘন লাল!

এক মিনিট দরজার ওদিকে পায়চারি করে নিঃশব্দে চলে গেল।

পরিচয় দর্শনেই—মস্তান।

দু-চারজন নানান বয়সের মেয়েও কৌতূহলে দেখে যাচ্ছে আমাকে—এমন কাণ্ড বোধহয় এসব বাড়িতে হয়ই না, আর হলেও বোধহয় খুবই কম। মেয়েগুলির ভাষা অধিকাংশই বিশেষ-বিশেষ অঞ্চলের বাঙলা অথবা ভাঙা-ভাঙা হিন্দি।

মেয়েগুলির চোখে মুখে বাঙলা বা বিহারের এক-একটি গ্রাম যেন ভেসে উঠতে লাগল।

আর বন্ধু সরোজের চিন্তা ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে দেবার ইচ্ছা হচ্ছিল। কেননা, ওদের দেখেশুনে আমার মনে হচ্ছিল—ওরা সবাই কাঁহুনির মতোই; অপবিত্র নোংরা বা জঘন্য নয়। ওরা সবাই এসেছে এমন কোনো অসহ্য যন্ত্রণায়, যার জন্য ওদের দায়ী করা চলে না।

কাঁহুনির জীবন আমি সেদিন সবটা জানতে পারি নি, জানা সম্ভবও ছিল না। বেশ কয়েকবার গেছি ওর কাছে, আর সব বার ওর সঙ্গে দেখাও হয় নি।

শেষের দিকে একদিন ওর কাছ থেকে বেরিয়ে

ক-পা এগিয়ে গিয়ে সিগ্রেট কিনতে যাচ্ছি, সেই হাতে বালা ও গলায় লকেটযুক্ত রুপোর চেনওয়ালা লোকটি আমার মুখোমুখি।

কী মোসাই, কী কত্তে আসেন বলুন তো?

রিপোর্ট সংগ্রহ করতে গেলে অনেক বাধার মোকাবিলা করতে হয়। আমি মানসিক দিক দিয়ে প্রস্তুত ছিলাম। আতঙ্ক মনের ভেতরে চাপা দিয়ে বললাম: যা আমাদের কাজ, তাই করতে আসি।

কী কাজ আমনার?

বললাম খুলে।

সে মোসাই ক-দিন লাগে? দেখুন মোসাই, সাফ-সাফ বলে দিচ্চি, বেশি ঘুরঘুর করবেন না।

বুঝলাম লোকটার শাসানি—আর এরা পারে না হেন কাজ নেই।

লোকটির আচরণ বলেছিলাম কাঁছুনিকে। সে বঁটিতে একটা নাশপাতি কাটতে গিয়ে আঙুল কেটে ফেলেছিল।

ইতিমধ্যে ওর কাছ থেকে যতটুকু জানতে পেরেছি, তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই—সেই ক্রীতদাসী বিক্রি হবার ইতিহাসের ধারাবাহিকতাই মনে হয়েছে।

ওকে বিয়ে করে নিয়ে গিয়ে মাসখানেক রাখে ট্রাক-মালিক নামে পরিচয় দেওয়া লোকটি। তার পরে তাকে বিক্রি করে দেওয়া হয় বিহারের এক জমিদারের কাছে। সেখানে একটি বাড়িতে ছিল মাস ছয়। তারপর আবার সে হাত-ফেরতা হয়ে আসে এক জঙ্গলব্যবসায়ীর বাংলোতে। সে দশ-বারো মাস। তারপর সে আসে এখানে।

ও বুঝতে পারত, তাকে কেনাবেচা হচ্ছে—ভাষায় নয়, হাবে-ভাবে। কিন্তু তার কোন উপায় ছিল না। প্রথম দিন থেকেই সেই অবাঙালিরা—যাদের ভাষা সে বিশেষ বুঝত না, তারা তার পেটে পিস্তল ঠেকিয়ে বলেছিল: বাত নেহি শুননে সে হি খত্‌ম্ কর দুংগা। বুঝলি? কোথা না-শুনলেই একদম ফায়ার কোরে দিব। বুঝলি?

সে অনেকবার অনেক রকম চেষ্টা করেছে পালিয়ে আসার জন্য, বিফল হয়েছে। ওদের চড়-চাপড় লাথির আঘাতে আহত হয়েছে, জ্ঞান হারিয়েছে। সে কত কেঁদেছে, কেঁদে-কেঁদে কত রাত ভোর করেছে। শেষ পর্যন্ত এখানে এসে ভাইকে চিঠি দিয়েছে—হ্যাঁ কাঁছুনিকে অ-আ-ক-খ লিখতে আমি শিখিয়েছিলাম। যাই হোক, ভাইয়ের সঙ্গে এখানে দেখা হবার কথা সে জীবনে ভুলতে পারবে না। ভাইকে দেখে সে শুধু কেঁদেছিল, ভাই কিন্তু একফোঁটা চোখের জল ফেলতে পারে নি।

কাঁছুনি বলেছিল: অল্প শোকে কাতর আর বেশি শোকে পাথর—ভাইয়ের সে অবস্থা হইচিল।

তুমি যদি পার বড়দা, এখান থাকতে আমাকে নিয়ে যাও।—খুবই নীচু স্বরে খুবই সতর্কভাবে বলেছিল কাঁছুনি?

আ-আমি?

হুঁ, তুমি। ক্যানে পারবে নি?

তু-তুমি কোথায় যাবে?

আমি তোতলাতে লাগলাম। আমি তো জানি যে অবস্থায় সে পৌঁছে গেছে, তার আর কোথাও ঠাঁই নেই। গ্রাম তাকে নেবে না, শহর তাকে ছেড়ে কথা বলবে না।

সেদিন যখন আমরা কথা বলছিলাম, তখন প্রথম দিকে লক্ষ করি নি, কাঁছুনি মুখে পাউডার ঘষে নি, চোখে কাজল পরে নি, অথচ সন্ধে হতে খুব বেশি দেরি ছিল না।

কোথায় যাবে? কে তোমাকে ঠাঁই দেবে? আমি যতটুকু জানি তোমাদের মতো মেয়েদের কোনো ব্যবস্থা নেই। নারী-আশ্রম কেমন আছে, কতগুলি আছে, আর সেসবের পরিস্থিতি কী, আমার সঠিক জানা নেই।

সে চাপা দৃঢ় গলায় বললে: কুন-অ বাড়িতে কাজ করব। সব কাজই ত আমার জানা রইচে।

কে ওকে বাড়িতে কাজ দেবে, ভাবতে লাগলাম

—তেমন উদার বন্ধুবান্ধব বা আত্মীয়স্বজনের নাম মনে পড়ল না।

এক-দিনে বুঝতে পেরেছি, এখানে কাঁছুনিদের জীবন অসহ্য। মাসি-মস্তানদের কব্জায় কাঁছুনিরা। তারা যেন স্ত্রী-জন্তু, মাংস বিক্রি করে যে পয়সা আসে, তার সিংহভাগটাই ওদের খপ্পরে। ডাকতার? সে নমো নমো···

অনেকেই তো থেকে যাচ্ছে! প্রশ্ন করি আমি।

কী করবে, নিরুপায়। কিন্তুন বড়দা, কেউ-কেউ পসন্দ করে নি। আমি বলচি তোমাকে, শুন-অ—কেউ পসন্দ করে নি—নরককে কেউ পসন্দ করে?

জানি না, এত বিশাল জ্ঞান নেই আমার এদের সম্বন্ধে, তবু মনে হল কাঁছুনির আকুলতায় বেশ কিছুটা সত্য আছে। হয়তো পুরোটাই সত্য আছে—আমি আর কতটুকু জানি?

বড়দা, বড়দা—কাঁছুনি আমার দু-হাত ধরল ওর দু-হাত দিয়ে—আগে কখনো আমাকে স্পর্শ করে নি; আমার কিন্তু ওর প্রতি সামান্যতম ঘৃণা জাগল না।—পাঁচ-পাঁচটা দিন কুন-অ ব্যবস্থা করে দাও—আমি নিজে খুঁজে লিব কুন-অ কাজ!

ভাবি, অসম্ভব! আমি কী করব? আচ্ছা বিপদে পড়া গেল তো! এলাম রিপোর্ট নিতে, হলাম দায়গ্রস্ত। আমার দায় কিসের! কিসের দায়!

ভাবছি, এই পাগলামির অথবা এই উৎপাতের হাত থেকে কী করে উদ্ধার পাই!

একবার বেরিয়ে গেলে আর জীবনে এ-দিকে পা দেব না।

প্রশ্ন করি: এখানে তো নিজের পয়সায় অনেক জিনিস করেছ, সেগুলো কী করবে?

চার দিকে তাকাতে-তাকাতে বলি। যদিও ওসবের মূল্য, টাকায় বেশি না, তবু ওর বস্তুগত আকর্ষণের জায়গাটি খুঁচিয়ে জাগিয়ে দিতে চাই। জানি এই মেয়েরা শাড়ি জামা গয়না ইত্যাদির জন্য মরে যেতেও রাজি। কাঁছুনি তো তাদের বাইরে নয়।

সে বললে: কিছুটি লিব নাই, আমি রেডি হইচি।

শিরে আমার বজ্রাঘাত, অন্ধকার নেমে আসছে ঘরে, সুইচ টিপে আলো জ্বালা হল। সেই মাসি একবার এসেছিল—তাকে টানা বারান্দায় ফিশফিশ করে কী বুঝিয়ে এসেছে কাঁছুনি।

আজকে কাঁছুনির কথায় বার্তায়, চলাফেরায় প্রথম থেকেই কেমন যেন চনমনে ভাব—এতক্ষণে চিন্তা করে বুঝতে পারছি।

কী যে বলব আর কী যে করব, ভেবে কূল পাই না।

বলি: আজ তো আমাকে অফিসে যেতে হবে—মাইনে নিতে, তারপর সেখান থেকে যাব আরও দু-এক জায়গায়—তারপর···

না না—এমন সুযোগ আসবেক নাই···

তোমাকে সঙ্গে নিয়ে কী করে ঘুরি?

লিয়ে চলো, লিয়ে চলো বড়দা—কাঁছুনি এই একই গভীরতম আবেদন কয়েকবার জানাল। তারপর সে যেন আড়ষ্ট হয়ে গেল হঠাৎ—সে যেন বুঝতে পারল, আমি তাকে এড়িয়ে যাচ্ছি।

একটা সিগ্রেট ধরিয়ে তাতে ধীরে-ধীরে টান দিতে-দিতে, ভীষণ এক বিপদের হাত থেকে উদ্ধার পেয়েছি, ভাবতে-ভাবতে—'চলি কাঁছুনি—চলি—' বলতে-বলতে বেরিয়ে এলাম, তারপর গলি তন্ন গলিতে মেয়েদের ভিড় বাঁচিয়ে বড়ো গলিটিতে পা দিয়ে মনে হল, যেন একঝলক মুক্ত বায়ুর আস্বাদ পেলাম।

আসবার সময় ইচ্ছে করেই কাঁছুনির মুখের দিকে চেয়ে দেখি নি।

হাঁটতে-হাঁটতে, কী-সব ভাবতে-ভাবতে, যখন বড়ো রাস্তার মোড়ের কাছাকাছি, কলকাতার সন্ধ্যা তখন আলোয়-আলোয় রমণীয়। হঠাৎ শুনতে পেলাম এক নারীকণ্ঠের তীব্র চিৎকার। পেছন ফিরে দেখি—ছুটতে-ছুটতে আসছে কাঁছুনি, আর বলছে—"বড়দা

—বড়দা—আমাকে লিয়ে যাও বড়দা···এরা আমাকে মেরে ফেলবেক—"। এই বাক্যগুলি সে বার-বার বলে চলেছে, আর তার পেছনে ছুটে আসছে, সেই বালা হাতে লোকটি, যে বারবার কাঁছুনির চুল ধরে টেনে থামাবার চেষ্টা করছে, আর কিল চড় ঘুঁষি চালিয়ে যাচ্ছে সমানে সুযোগ পেলেই। কাঁছুনি পড়ে যাচ্ছে মাটিতে, আবার উঠে দাঁড়িয়ে ছুটে আসছে। কিন্তু ওই জানোয়ারের হাত থেকে কতক্ষণ, কত দূরে পালাতে পারবে কাঁছুনি ?

আমি পালিয়ে এলাম।

কিন্তু মনে হল, গ্রামবাঙলার অন্ধকার, সমুদ্রের উন্মত্ত ঢেউয়ের মতো আমার পিছু-পিছু ছুটে আসছে। কখন যে ওই অন্ধকার ঢেউয়ের রাশি আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে, কে জানে !

জাতীয় ওষুধ-নীতি কার স্বার্থে ?

পীযূষকান্তি সরকার

ওষুধ-নীতি নিয়ে আলোচনা করতে হলে প্রথমেই এর উদ্দেশ্য এবং প্রয়োজনীয়তার প্রশ্ন এসে পড়ে। কোনো দেশের সরকারের বিভিন্ন বিষয়ে দৃষ্টিভঙ্গি কী হবে, এবং কিভাবে সেটি কার্যকর হবে, সে বিষয়ে যেসব আগাম সিদ্ধান্ত সরকার নিয়ে থাকেন তাকেই দেশের সরকারি নীতি বলা হয়। জাতীয় স্বার্থ সুরক্ষিত করাই হল যে-কোনো সরকারি নীতির মূল লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য। অন্য বিচারে, যেহেতু বিভিন্ন রাজনৈতিক দল সরকার গঠন করে থাকেন, সেজন্য সরকারি নীতি হল আসলে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সরকারে আসীন দলের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির বহিঃপ্রকাশ।

দেশের বর্তমান ওষুধ-নীতি

স্বাধীনতালাভের পর ত্রিশ বছর পর্যন্তও ভারতে ওষুধ সম্বন্ধে কোনো সরকারি নীতি ছিল না। দেশের ওষুধ-শিল্পের অবস্থা, ওষুধের উৎপাদনক্ষমতা, আমদানির পরিমাণ, স্বয়ম্ভরতা অর্জনের উপায় প্রভৃতি খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় সুপারিশ করার জন্য ১৯৭৪ সালে বিশেষজ্ঞদের নিয়ে সরকার একটি কমিটি গঠন করেন, যার নেতৃত্বে ছিলেন তদানীন্তন সংসদ-সদস্য জয়সুখলাল হাথী। ওই কমিটি বিশেষ পরিশ্রম করে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের ওষুধ-উৎপাদন-কেন্দ্রগুলি পরিদর্শন করেন এবং বিভিন্ন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে ১৯৭৫ সালে সরকারের কাছে তাঁদের প্রাপ্ত তথ্যাদি পেশ করেন। হাথী কমিটির এই রিপোর্টকে যুগান্তকারী বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে। কারণ, প্রয়োজনীয় ওষুধ (এসেন-সিয়াল ড্রাগ) সম্বন্ধে ইদানীং যে ধারণা ব্যাপকভাবে সংশ্লিষ্ট মহলে চালু হয়েছে, হাথী কমিটিকেই অন্তত ওই ধারণার জনক বলা যেতে পারে। তাঁরাই প্রথম সুপারিশ করেন যে, আমাদের দেশের লোকের যে-সব অসুখ হয়ে থাকে, মাত্র ১১৭টি ওষুধ দিয়েই তার বেশির-ভাগ অসুখের চিকিৎসা করা সম্ভব ; অর্থাৎ,

[আর জি কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল-এর ফারমাকোলজি বিভাগের প্রধান, 'ড্রাগ অ্যাকশন ফোরাম' গোষ্ঠীর অন্যতম উদ্যোক্তা, এবং উক্ত সংস্থা থেকে প্রকাশিত মুখপত্র 'ড্রাগ ডিজিস ডকটর'-এর সম্পাদক এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ডাকারি সংগঠনের সাথে সক্রিয়ভাবে জড়িত।]

ওই ওষুধগুলিই আমাদের দেশের প্রয়োজনীয় ওষুধ। হাথী কমিটির অনুসন্ধানের ফলে ধরা পড়ে যে, ওষুধের গুণমান বজায় রাখার জন্য সরকারি সংস্থাগুলির (ভেষজ নিয়ন্ত্রক সংস্থা বা ড্রাগ কনট্রোল অথরিটি) কাজকর্ম খুবই নিম্নমানের এবং অপ্রতুল। ভারতের প্রত্যেক রাজ্যে ওই সংস্থার প্রসার ঘটানো, কাজের দক্ষতা এবং মানের উন্নতি ঘটানোর সুপারিশ করা হয়। তৃতীয় যে গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ করা হয়, সেটা হল সরকারি-মালিকানাধীন (পাবলিক সেকটর) ওষুধ-শিল্পের এমন বিকাশ ঘটানো যাতে ওই সংস্থা দেশের ওষুধ-শিল্পের ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিতে পারে এবং সরকারকে বেসরকারি ওষুধ-শিল্পের চাপের কাছে নতিস্বীকার করতে না হয়। চতুর্থ সুপারিশ ছিল: বিপণনে ওষুধের ব্র্যানডনামের বদলে পর্যায়ক্রমে গোত্রের নাম (জেনেরিক নেম) ব্যবহার। কিন্তু সরকার নিজেদেরই নিযুক্ত কমিটির সুপারিশগুলির বেশির ভাগই অগ্রাহ্য করলেন। এমনকি, হাথী কমিটির সুপারিশগুলি দেশের বেশির-ভাগ মানুষের কাছে অজ্ঞাত রয়ে গেল। কারণ, অন্যান্য সরকারি কমিটির রিপোর্টের মতো হাথী কমিটির রিপোর্ট পর্যাপ্ত সংখ্যায় ছাপা হল না—সরকারি কিংবা বে-সরকারি প্রকাশন-সংস্থায় হাথী কমিটির কোনো রিপোর্ট কিনতে পাওয়া যায় না।

১৯৭৮ সালে জনতা সরকারের আমলে প্রথম সরকারি ওষুধ-নীতি ঘোষিত হয়—যাকে অবশ্য ওষুধ-নীতি না বলে ওষুধের মূল্যনির্ধারণনীতি বলাই শ্রেয়। কারণ, সরকারি নীতির প্রয়োজনীয় অঙ্গ-গুলির প্রায় সবগুলিই এতে অনুপস্থিত। সরকারি ভেষজনীতিকে বাস্তবায়িত করার উদ্দেশ্যে ১৯৭৯ সালে ওষুধের মূল্য-নিয়ন্ত্রণ-অধ্যাদেশ (ড্রাগ প্রাইসেস কনট্রোল অর্ডার ডি. পি. সি. ও. ১৯৭৮) জারি করা হয়। এই মূল্যনিয়ন্ত্রণ-আদেশে আমাদের দেশে চালু যাবতীয় ওষুধকে চারটি শ্রেণীতে ভাগ করে মুনাফার হার (মার্ক্ আপ) নির্দিষ্ট করে দেওয়া হল—

ওষুধের শ্রেণী	মুনাফার হার
১। জীবনদায়ী ওষুধসমূহ	৪০%
২। প্রয়োজনীয় ওষুধ	৫৫%
৩। অপেক্ষাকৃত কম প্রয়োজনীয়	১০০%
৪। অপ্রয়োজনীয় ওষুধ এবং সস্তা-চালু-হওয়া কিছু প্রয়োজনীয় ওষুধ	সীমাহীন

মুনাফার হার বেঁধে দেওয়া এবং বিভিন্ন ধরনের ওষুধে বিভিন্ন মূল্য নির্ধারণের পেছনে সরকারি যে নীতি কাজ করেছে, সেটা হল জীবনদায়ী এবং প্রয়োজনীয় ওষুধসমূহে মুনাফার হার কম হলে সাধারণ মানুষ কম দামে প্রয়োজনীয় ওষুধ পাবেন। এবং, অপেক্ষাকৃত কম মুনাফায় জীবনদায়ী এবং প্রয়োজনীয় ওষুধে বিক্রি করার জন্য ওষুধ-ব্যবসায়ীদের যে "ক্ষতি" হবে, অপেক্ষাকৃত কম প্রয়োজনীয় এবং সীমাহীন মুনাফার ওষুধ তৈরি এবং বিক্রি করে তাঁরা সেটা পুষিয়ে নেবেন। সরকারি যুক্তি অনেকটা এইরকম যে, তাঁদের ওষুধ-নীতিতে সাপ আর ব্যাঙ উভয়েই সুখে-শান্তিতে থাকবে। ব্যবসায়ীদের তোষণ করে সরবরাহ সুনিশ্চিত করার সরকারি নীতি ব্যর্থ হল। নিয়ন্ত্রণ-আদেশে ওষুধ-কোম্পানিগুলি খুব স্বাভাবিক-ভাবেই প্রয়োজনীয় ওষুধ তৈরি কমিয়ে বা প্রায় বন্ধ রেখে অপ্রয়োজনীয় ওষুধ বা অ-বৈজ্ঞানিক অথবা যেসব ওষুধ আদপেই ওষুধ নয় অথচ আমাদের দেশে ওষুধ হিসেবে বিক্রি হয়—সেইসবগুলি তৈরির পরিমাণ বাড়িয়ে দিল। উদাহরণস্বরূপ আমরা পর-পৃষ্ঠার সারণীটি লক্ষ করতে পারি।

এরই ফল হিসাবে একদিকে যেমন দেশে প্রয়োজনীয় ওষুধের চিরস্থায়ী ঘাটতি চলতে থাকল, অন্যদিকে তেমনি ঘটল অপ্রয়োজনীয় ওষুধের উৎপাদনে এবং সরবরাহে বহুল বৃদ্ধি। ভারতের এক কোটি যক্ষ্মা-রোগী বা ৪০ লক্ষ কুষ্ঠরোগীর প্রয়োজনের তুলনায় উক্ত রোগের ওষুধ তৈরি হয় যথাক্রমে মাত্র এক-তৃতীয়াংশ এবং এক-চতুর্থাংশ। কারণ, যক্ষ্মারোগের ওষুধ আই

কয়েকটি অপরিহার্য ওষুধের উৎপাদনের ক্রমাবনতি এবং অপেক্ষাকৃত কম প্রয়োজনীয় ওষুধের উৎপাদনে স্ফীতি

ওষুধ	অনুমোদন-সামর্থ্য	প্রকৃত উৎপাদন (মেট্রিক টন)			
		১৯৪০	১৯৪১	১৯৪২	১৯৪৩
পি এ এস (যক্ষ্মা-নিরোধক)	১১০	১৩·৫	১৩·৭৪	৫·৭	শূন্য
আই এন এইচ (যক্ষ্মা-নিরোধক)	৮০	৭৩	৫৪·০০	৭১·৫	শূন্য
প্রোটিনেক্স্ (সম্পূরক খাদ্য)	১১০	২৫৪·৪৬	২৫২·১৫	২৭৫·৮৭	অজ্ঞাত

তথ্যগুলি বহুজাতিক ওষুধ-প্রতিষ্ঠান ফাইজার কোম্পানি সম্পর্কে প্রযোজ্য।

এন এইচ-এর দাম মাত্র দশ পয়সা, এবং কুষ্ঠরোগের ওষুধ ড্যাপসোন-এর দাম মাত্র তিন পয়সা। স্বভাবতই, এই-জাতীয় সস্তা ওষুধ উৎপাদনে ব্যবসায়ীদের উৎসাহ নেই। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা প্রয়োজন, দেশ থেকে যক্ষ্মা এবং কুষ্ঠরোগ নির্মূল করার সরকারি কর্মসূচী গৃহীত হয়েছিল দু দশকেরও বেশি সময় আগে। অথচ চালু ওষুধ-নীতি দ্বারা ওষুধ কোমপানিগুলিকে পর্যাপ্ত পরিমাণে যক্ষ্মা আর কুষ্ঠ রোগের সস্তা ওষুধ তৈরি করতে বাধ্য করতে সরকার ব্যর্থ হয়েছেন—অথবা সরকারি সদিচ্ছার অভাব রয়েছে। অন্যদিকে, ঢালাও আমদানি-নীতির ফলে যক্ষ্মা আর কুষ্ঠ রোগের ওষুধ 'রিফামপিসিন'—যার দাম কমপক্ষে তিন টাকা—সেই ওষুধ দোকানে অঢেল পরিমাণে পাওয়া যায়। কারণ, ওই ওষুধে মুনাফা অনেক বেশি। সামান্য দশ পয়সার ভিটামিন 'এ'-র যোগানের অভাবে প্রতি বছর ২৫ থেকে ৪০ হাজার শিশু অন্ধ হয়ে যায়। কারণ, দেশে প্রয়োজনের তুলনায় ভিটামিন 'এ'-র উৎপাদন অনেক কম। আবার ওই স্বল্প পরিমাণে উৎপন্ন ভিটামিন 'এ'-র অনেকটাই চলে যায় মুরগি আর পশুখাদ্য এবং অপ্রয়োজনীয় ওষুধ তৈরিতে। দেশের বিভিন্ন স্থানে, বিশেষ করে পার্বত্য এলাকা-গুলিতে, এমন হাজার হাজার শিশু জন্ম নিচ্ছে যারা পরবর্তী কালে 'স্বল্পবুদ্ধি পেটমোটা বামনে' (ক্রেটিন-এ) পরিণত হচ্ছে। এর কারণ, ওই এলাকাগুলিতে খাদ্যে এবং জলে আয়োডিনের ঘাটতি। অথচ খুবই কম খরচে এর প্রতিকার করা সম্ভব। ওই এলাকা-গুলিতে পর্যাপ্ত পরিমাণে আয়োডিন-ঘটিত লবণ জোগানো গেলেই এই আয়োডিন-অভাব-জনিত ব্যাধি থেকে পরিত্রাণ পাওয়া সম্ভব। অথচ আমাদের দেশে প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম আয়োডিন-ঘটিত লবণ তৈরি হয়। যতটা তৈরি হয়, তার অনেকটা আবার বড়ো বড়ো নগরে বা শহরে, যেখানে লোকের ক্রয়ক্ষমতা বেশি, সেখানে বিক্রির জন্য চলে আসে—যদিও তা বেআইনি। এবং অকারণে আয়োডিন-ঘটিত লবণ ব্যবহার অপ্রয়োজনীয়, কোনো-কোনো ক্ষেত্রে ক্ষতিকারকও বটে।

ভেষজনীতির শিথিলতার তথা ফাঁকফোকরের সুযোগ নিয়ে ওষুধ-কোমপানিগুলি প্রয়োজনীয় ওষুধ-সহ সব ধরনের ওষুধের দাম গত দু-তিন বছরের মধ্যে কয়েকগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। পরপৃষ্ঠার সারণীটি লক্ষ করলে এই মূল্যবৃদ্ধির অনুপাত সম্বন্ধে ধারণা হবে।

ওষুধসমূহের নাম	থেরাপেটিক গ্রুপ	কোমপানি	সর্বোচ্চ পাইকারি মূল্য	
			১৯৭৪	১৯৮৬
			টা. প.	টা. প.
স্ট্রেপটোনেক্স্	যক্ষ্মানিরোধক	প.ফাইজার	০·৭০	২·৭৭
সোডিয়াম পি এ এস	,,	,,	৫·৬২	১৫·৬৮
প্রোটিনেক্স্	,,	,,	৫·২০	১৩·৩৭
ইনস্যুলিন	ডায়াবেটিস-নিরোধক	বুটস্	৫·০১	১১·১০
ক্যাডিকুইন	ম্যালেরিয়া-নিরোধক	ক্যাডিলা	০·১৭	০·২৮
রেচলার	ক্লোরামফেনিকল	সারাভাই	০·৩৬	০·৫৭
ক্যালপল	যন্ত্রণা ও জ্বর	বারোজ	০·০৭	০·২০

ওষুধের মূল্য-নিয়ন্ত্রণ-অধ্যাদেশ (ডি. পি, সি.ও, ১৯৭৯) চালু হবার কিছুদিন পর থেকেই ওষুধ-কোমপানিগুলির অ্যাসোসিয়েশন বিশেষ করে ও পি পি আই (অরগানাইজেশন অব ফারমাসিউটিক্যাল প্রোভিউসারস অব ইনডিয়া), যেটি মূলত বিদেশী বহুজাতিক কোমপানিগুলির সংস্থা, এবং আই ডি এম এ (ইনডিয়ান ড্রাগ ম্যানুফ্যাকচারারস অ্যাসোসিয়েশন—দেশী সংগঠিত বৃহৎ ওষুধ-শিল্পগুলোর সংস্থা) ক্রমাগত প্রচার করতে শুরু করে যে, সরকারি নীতির ফলে ওষুধের ব্যাবসা অলাভজনক হয়ে পড়েছে, এবং এই অবস্থা চলতে থাকলে তাদের পক্ষে ব্যাবসা বন্ধ করে দেওয়া ছাড়া উপায় নেই। ব্যবসায়ীদের এই প্রচারে সরকারের আশঙ্কা হয়, ওষুধ-ব্যবসায়ীরা সত্যি-সত্যি হয়তো ওষুধ তৈরি বন্ধ করে দেবে। সরকার অবস্থা খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেবার আশ্বাস দেন। ওষুধ-কোমপানিরা এই সুযোগে নিজেদের খরচে পছন্দমত এক সংস্থাকে দিয়ে (এন. সি. এ.ই. আর., ন্যাশনাল কাউনসিল অব অ্যাপ্লায়েড ইকনোমিক রিসারচ) সুবিধাজনক তথ্যাদি সংগ্রহ করে সরকারের কাছে হাজির করেন।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, কোনো শিল্পের লাভ-লোকসান খতিয়ে দেখা সরকারি সংস্থা ব্যুরো অব ইনডাস্ট্রিয়াল কসট অ্যানড প্রোডাকশন (বি আই সি পি)-র কর্তব্য ; সরকারি নীতি-পরিবর্তন সরকারি সংস্থার দেওয়া তথ্যের ওপরই ভিত্তি করে হয়ে আসছে। প্রস্তাবিত নতুন ভেষজ-নীতি কিন্তু বি. আই. সি. পি.-র দেওয়া তথ্যের ওপর ভিত্তি করে রচিত হয় নি।

ওষুধ কোমপানিদের দেওয়া তথ্য রসায়ন এবং সার মন্ত্রণালয়ের (মিনিসট্রি অব কেমিক্যালস অ্যানড ফার্টিলাইজারস) অধীনে গঠিত দেশের সর্বোচ্চ ভেষজ সংস্থার কাছে বিচার-বিবেচনার জন্য পাঠানো হয়। এন. ডি. পি. ডি. সি. হল এমন একটি সংস্থা যার সভ্যদের মধ্যে কমবেশি ৫০ শতাংশ হলেন প্রত্যক্ষভাবে ওষুধ-শিল্পের সঙ্গে যুক্ত। অবশিষ্ট সভ্যেরা হলেন সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলির আমলা। এন. ডি. পি. ডি. সি-র সভাপতি হলেন এমন একজন লোকসভা-সদস্য যিনি স্বয়ং এক নামজাদা ওষুধ-কোমপানির মালিক। বলা বাহুল্য, ওষুধ কোমপানিদের দেওয়া তথ্যগুলিকে সহানুভূতির সঙ্গেই বিচার করে দেখার জন্য এই সংস্থা তিনটি কার্যকরী সমিতি (ওয়ারকিঙ গ্রুপ) তৈরি করলেন। কার্যকরী সমিতির সিদ্ধান্তসমূহ চূড়ান্ত করার জন্য একটি পরিচালক সমিতি (স্টিয়ারিং কমিটি) গঠিত হয়। এই পরিচালক সমিতি বেশ কয়েকটি বিষয় ঐকমত্যে পৌঁছাতে অসমর্থ হওয়ায় পরবর্তী কালে ওই সুপারিশগুলি পারলামেনটের এক কমিটির (ড্রাগ কনসালটেটিভ কমিটি অব দ্য পারলামেনট) কাছে পাঠানো হয়। পারলামেনটারি কমিটি পরিচালক কমিটির সুপারিশ অনুমোদন না করে ফেরত পাঠিয়ে দেন। এই ঘটনার পরে-পরেই ওই পারলামেনটারি কমিটিকে ভেঙে দিয়ে নতুন কমিটি তৈরি হয়, যাতে আগের পারলামেনটারি কমিটির একজন সদস্যও স্থান পান নি। নতুন কমিটি গঠনের পর নতুন ভেষজ-নীতির খসড়া চূড়ান্ত হয়ে লোকসভায় পেশের অপেক্ষায় দিন গুনছে।

প্রস্তাবিত নতুন ভেষজনীতি

নতুন ভেষজনীতির খসড়া সাধারণের কাছে সরকারি গোপন নথি হিসেবে রাখা হয়েছে, যদিও ব্যবসায়ীদের কাছে সব তথ্যই উন্মুক্ত। গত বছর দুই ধরে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় যেসব তথ্য প্রকাশিত হয়েছে, তার ওপর ভিত্তি করে বলা চলে যে নতুন ভেষজনীতি এমনভাবে রচিত হয়েছে যাতে কেবলমাত্র ব্যবসায়ীদের স্বার্থ রক্ষিত হবে, এবং জনগণের স্বার্থ নিদারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। নতুন ওষুধনীতিতে যেসব পরিবর্তনের কথা শোনা যাচ্ছে, তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল—ওষুধের মূল্যনিয়ন্ত্রণের পরিধিতে সংকোচন। বর্তমানে সরকারি মূল্যনিয়ন্ত্রণ আদেশের আওতায় ৩৪৭টি ওষুধ আছে; ওইসব ওষুধে মুনাফার হার নির্দিষ্ট করে দেওয়া আছে। প্রস্তাবিত নতুন ওষুধ-নীতিতে ওই নিয়ন্ত্রণকে শিথিল করে (ডি-কনট্রোল) মাত্র ৬৫টি ওষুধের ওপর মূল্যনিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা হচ্ছে। বাকি ওষুধগুলোতে এখন সীমাহীন মুনাফা করা সম্ভব হবে। এই ওষুধগুলোর ওপর থেকে মূল্য-নিয়ন্ত্রণ তুলে দেওয়ার অর্থ হল যে, এই ওষুধগুলির অবশ্যম্ভাবী মূল্যবৃদ্ধি ঘটবে। সাধারণ মানুষ আরো নাজেহাল হবেন। মূল্যনিয়ন্ত্রণের পরিধি সংকোচনের আরেকটি দিক হল, ওষুধ সম্পর্কে সরকারি দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন। প্রয়োজনীয় এবং অপ্রয়োজনীয় ওষুধের মধ্যেকার পার্থক্যের সীমারেখা কমিয়ে ছুটোকে প্রায় একই পর্যায়ে নিয়ে আসা হবে।

সরকার প্রয়োজনীয় ওষুধের ওপর মূল্যনিয়ন্ত্রণের পরিধিকে কমিয়ে এনে ব্যবসায়ীদের আরেক দফা সুবিধে করে দিয়ে ওষুধ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের কথা চিন্তা করেছেন। অর্থাৎ, সরকার কল্পনা করছেন যে, প্রয়োজনীয় ওষুধের ওপর থেকে নিয়ন্ত্রণ কমিয়ে দিলে ওষুধ-কোমপানিরা বেশি মুনাফার লোভে ওইসব বিনিয়ন্ত্রিত (ডি-কনট্রোলড) ওষুধ বেশি পরিমাণে তৈরি করতে উৎসাহিত হবে। তার ফলে একদিকে যেমন প্রয়োজনীয় ওষুধের ঘাটতি মিটবে অন্যদিকে ওষুধ-কোমপানিগুলির মধ্যে প্রতিযোগিতার ফলে ওষুধের মূল্যবৃদ্ধি ঘটবে না, হয়তো দাম কমে যাবে।

ওষুধ-ব্যবসায়ীদের অন্য যেসব সুবিধে দেবার কথা ভাবা হচ্ছে তার মধ্যে আছে বুনিয়াদি ওষুধ এবং তৈরি ওষুধের অনুপাত হ্রাস, এবং ওষুধের লাইসেন্স্ দেবার প্রথার পরিবর্তন। চালু ভেষজ আইনে বুনিয়াদি ওষুধ বাল্ক্ ড্রাগ এবং তৈরি ওষুধ (ফরমুলেশন) উৎপাদনের একটা অনুপাত নির্দিষ্ট করে দেওয়া আছে। এ ব্যাপারে দেশী ওষুধ-কোমপানি বিদেশী কোমপানির তুলনায় একটু বেশি সুবিধা ভোগ করে থাকে। নতুন আইনে বিদেশী ওষুধ-কোমপানিগুলিকে তুলনামূলকভাবে বেশি সুবিধা দেওয়ার কথা বলা হয়েছে।

বর্তমানে চালু ভেষজনীতিতে ওষুধ-কোমপানিরা যেসব ওষুধ তৈরি এবং বিক্রি করতে চায়, সেই-সমস্ত ওষুধের জন্য আলাদাভাবে লাইসেনসের জন্য আবেদন করা বাধ্যতামূলক। ভেষজনিয়ন্ত্রকের পক্ষে ওই আবেদন বিচার করে লাইসেনস মনজুর অথবা বাতিল করা সম্ভব। নতুন ভেষজনীতিতে এই প্রথাকে বাতিল

করে যে প্রথা চালু করার কথা বলা হয়েছে, সেটাকে বলা হবে 'ব্রড ব্যানড়িং'। এই পদ্ধতিতে প্রত্যেক ওষুধের জন্য আলাদা লাইসেনস নিতে হবে না। বুনিয়াদি ওষুধের জন্য লাইসেনস মনজুর করে মরজি-মতো বিভিন্ন বুনিয়াদি ওষুধ মিশিয়ে তৈরি (ফরমু্যলেশন) বানিয়ে বিক্রি করতে কোনো বাধা থাকবে না। এর অবশ্যম্ভাবী পরিণাম হবে, দেশে বর্তমানে যে হাজার-হাজার অবৈজ্ঞানিক, মিশ্রিত এবং ক্ষতি-কারক ওষুধ আছে, তার সংখ্যা কয়েকগুণ বৃদ্ধি পাবে।

শিল্পমালিকদের সরবরাহ করা যে তথ্যের ওপর ভিত্তি করে নতুন ভেষজনীতির খসড়া রচিত হয়েছে, সেইসব তথ্যের যাথার্থ্য সঠিকভাবে যাচাই করা হয় নি। চালু ভেষজনীতির ফলে দেশের ওষুধ-ব্যবসায় অ-লাভজনক হয়ে পড়েছে বলে ব্যবসায়ীরা যে যুক্তি হাজির করেছেন, বাস্তব চিত্র কিন্তু তা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। নীচের সারণীগুলি থেকে স্পষ্ট হবে যে, ওষুধ-ব্যবসায় অ-লাভজনক হয়ে পড়েছে বলে যে যুক্তি হাজির করা হয়েছে তা মোটেই ধোপে টেঁকে না। কারণ স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে ৮১ থেকে ৮৬ এই ছ বছরের মধ্যে ওষুধ-কোমপানিগুলির শেয়ারের ব্যাপক মূল্যবৃদ্ধি ঘটেছে।

ওষুধ-কোমপানিগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এ অভিযোগ কি সত্য ?

(কেমিক্যাল উইকলি অ্যান্ড টাইমস অব ইনডিয়া (মার্চ ৫/১৯৮৫, ফেব্রুয়ারি ১২/১৯৮৬)

শেয়ার-এর মূল্যবৃদ্ধির তালিকা

ক্রমিক সংখ্যা	নাম	৩১.১২.৮১	৩১.১২.৮৩	৩১.১২.৮৪	১২.২.৮৬
১.	গ্ল্যাকসো	২০'৫০	৩১'০০	২৪'২৫	৮৩'০০
২.	হেক্সট্	—	—	৩৭৫'০০	১০০০'০০
৩.	অ্যালেমবিক	৭০'০০	১৩৯'০০	৮৫'০০	১৪৫'০০
৪.	প.ফাইজার	২৪'০০	৩৬'০০	৪০'০০	১২৪'০০
৫.	বুট্স্	২৩'০০	৩৯'০০	৪৬'০০	২০০'০০
৬.	র‍্যানব্যাক্সি	১৯'৫০	৩৭'৫০	৩৬'৫০	১৫৫'০০
৭.	শারলে	৪২'৫০	৬৮'০০	৮০'০০	৪০৭'৫০

(সংক্ষেপিত)

ওষুধ-প্রস্তুতকারক সংস্থাগুলি কি সত্যিই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে ?

নির্বাচিত ৩০টি ভেষজ-প্রস্তুত-সংস্থার অর্থনৈতিক মুনাফার অনুপাত

সংস্থাগুলির নাম	আর্থিক বছর	মোট পুঁজি	মোট বিক্রয়	মোট লাভ	মোট নিয়োজিত মূলধনের শতকরা লভ্যাংশ
গ্ল্যাক্সো	জুন ৮৩	৯৩'৭৫	১৩৬'১৭	১৪'২৮	১৪'০৮
হেক্স্ট (ই)	ডিসেম্বর ৮৩	৪৯'৭০	৮০'৬৭	৯'০০	২৮'২৫
অ্যালেমবিক	ডিসেম্বর ৮৩	৩৩'০৮	৫৬'২৬	৫'৯৯	১৫'৬৪
প.ফাইজার	নভেম্বর ৮৩	৩৭'৫০	৫২'০৮	৫'৯৯	১৫'৬৪
জারমান রেমিডিজ	ডিসেম্বর ৮৩	২০'৯৯	৩১'৭৭	৪'৩৯	২২'১৩
পারক ডেভিস	নভেম্বর ৮৩	৮'৮৫	২৬'০৮	২'৫১	১৩'১৪
রোশ	ডিসেম্বর ৮৩	১৫'৩০	২২'৩০	৪'৫০	২৮'৩৪
র‍্যানব্যাক্সি	ডিসেম্বর ৮৩	৩৭'৫৩	৩৭'০৬	৩'৮৩	১৩'৫৮

(সংক্ষেপিত)

প্রথম শ্রেণীর কুড়িটি ভেষজ-প্রস্তুত সংস্থার আর্থিক ক্রমোন্নয়ন

সংস্থাগুলির নাম	সংস্থাগুলি কোন্ দেশের	বিক্রয় (অর্থমূল্যে) ১৯৭৯	১৯৮৪	বৃদ্ধির শতকরা হার
গ্ল্যাক্সো	ইউ.কে.	৩৫'১০	৫৪'৫৫	৫৫'৪১
সারাভাই	ইউ. এস সহযোগিতা	৩৩'৫৯	৫১'৩৪	৫২'৮৪
প.ফাইজার	ইউ. এস. এ.	২৮'৯৩	৪০'৬৫	৪০'৫১
হেক্স্ট	এফ. আর.জি.	১৭'৪৫	৩৩'১৬	৯০'০৩
ক্যাডিলা	—	৯'৮৭	২৮'৮৮	১৯২'৬০
বুট্স্	ইউ. কে.	১২'১৪	২৫'৬৭	১১১'৪৫
র‍্যান্ব্যাক্সি	—	৮'৭৫	২৩'৫৩	১৬৮'৯১
এসকেএফ (এসকে)	ইউ. এস. এ.	৮'২৩	১৭'১৫	১০৮'৩৮
আই ডি পি এল		৯'১০	১৬'৬০	৮২'৪১
সিপলা		৪'৫৪	১৫'৭৫	২৪৬'৯১

সূত্র : ও আর জি তথ্য।

(সংক্ষেপিত)

ওষুধ-শিল্পমালিকদের (বিশেষ করে বিদেশী বহুজাতিক সংস্থাগুলির) অন্য অভিযোগ এই যে, অত্যধিক সরকারি নিয়ন্ত্রণের ফলে ওষুধ-শিল্পের বিকাশ ব্যাহত হচ্ছে, এবং তাদের দাবির কাছে নতি স্বীকার করে নতুন ভেষজনীতিতে অনেক ওষুধকে নিয়ন্ত্রণের বাইরে নিয়ে আসার পরিকল্পনা করা হয়েছে। ওষুধ-ব্যবসায়ীদের এই দাবিও বাস্তব চিত্র থেকে আলাদা। এটা সর্বজনস্বীকৃত যে, মিশ্র অর্থ-নীতিতে শিল্প লাইসেনস মনজুর করার ক্ষেত্রে কিছু কড়াকড়ি বা নিয়ন্ত্রণ থাকা স্বাভাবিক এই কারণে যে, এই প্রথার ফলে দেশী, বিশেষ করে ছোটো, শিল্প-উদ্যোগের স্বার্থ সংরক্ষণ করা সম্ভব। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল যে, এই নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে একটি সুষম উন্নয়ন এবং স্বয়ম্ভরতা অর্জনের লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব। সেইজন্য দেশের স্বার্থে বিদেশী মূল-ধনের নিয়ন্ত্রণ কাম্য। অত্যধিক নিয়ন্ত্রণের ফলে শিল্পের উৎপাদন এবং বিকাশ ব্যাহত হচ্ছে—এ তথ্যও সঠিক নয়। অনেক ওষুধ উৎপাদনের ওপর কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। এমনকি, ১৯৮৫ সালে যে ৯৪টি ওষুধের ওপর থেকে নিয়ন্ত্রণ তুলে নেওয়া হয়েছে একচেটিয়া এবং প্রাক্তন বিদেশী ওষুধ কোমপানিগুলি সেই সুযোগে কিন্তু উৎপাদনক্ষমতার পুর্ণ সদ্ব্যবহার না করে লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করে নি। ওষুধের কাঁচামাল আমদানি অব্যাহত রেখে তারা ব্যাবসা বাড়িয়ে চলেছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে আরেক দফা সুবিধে, অর্থাৎ আরও নিয়ন্ত্রণ শিথিল করাতে দেশের ওষুধ-চিত্র আরো খারাপ হবে, এবং ওষুধ-শিল্পে স্বয়ম্ভরতা অর্জনের লক্ষ্য ব্যাহত হবে বলে আশঙ্কা হয়।

নীচের সারণীটি লক্ষ করলে ব্যাপারটি স্পষ্ট হবে।

কোমপানি	বছর	রেজিসট্রেশনের সংখ্যা	রেজিসট্রেশনের সদ্ব্যবহার
১। ডুকার ইনটারক্রান	১৯৮০-৮১	৩৯	১৮
	১৯৮৪	৮	শূন্য
২। বোম্বেরিংগার নল	১৯৮০-৮১	৬	৩
	১৯৮২-৮২	৪	শূন্য
	১৯৮৩-৮৪	৪	৪
৩। রেকিড অ্যান্ড কলম্যান	১৯৮০-৮১	১	১
	১৯৮২-৮৩	৬	শূন্য
	১৯৮৪	৪	শূন্য
৪। পাবক ডেভিস	১৯৮৩-৮৪	৮	শূন্য

(সূত্র : নিউজ লেটারস অব ইনডিয়া ইনভেসটমেনট সেনটার)

আলোচনার শুরুতেই উল্লেখ করা হয়েছিল যে, আমাদের দেশে আদৌ কোনো ভেষজনীতি নেই। ভেষজনীতির নামে যেটি চালু আছে বা যেটি চালু হতে চলেছে, তাকে ভেষজনীতি না বলে ভেষজের মূল্যনির্ধারণনীতি বলাই বাঞ্ছনীয়। কারণ, প্রথমত, রোগপ্রতিরোধে, অসুখ সারাতে এবং মৃত্যুকে ঠেকাতে ওষুধের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অস্বীকার না করেও বলা যায় যে, সার্বিক স্বাস্থ্যব্যবস্থায় ওষুধের ভূমিকা নগণ্য। অধিকগুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল —পর্যাপ্ত খাদ্য, পরিস্রুত জলের সরবরাহ, সর্বজনীন

পরিচ্ছন্ন পরিবেশ সৃষ্টি এবং সকলের জন্য অন্তত প্রাথমিক চিকিৎসার সুবন্দোবস্ত। যেহেতু ওষুধ সার্বিক স্বাস্থ্যব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ, তাই দেশের ভেষজনীতিকে দেশের স্বাস্থ্যনীতি থেকে পৃথক করে বিবেচনা করা বা রচনা করা যেমন অর্থ-হীন, তেমনি অনুচিত। বাঞ্ছিত ফল লাভ করতে হলে স্বাস্থ্যনীতির সঙ্গে সংগতি রেখে এবং স্বাস্থ্য-নীতির সাথেই ভেষজনীতি প্রণয়ন করা আবশ্যিক এবং যুক্তিসংগত।

ভেষজনীতি প্রণয়নের প্রাথমিক পদক্ষেপ হওয়া উচিত—বিভিন্ন ওষুধের প্রয়োজন পরিমাপ করা। অবশ্যই এই প্রয়োজন-পরিমাপের মাপকাঠি হবে রোগ-মৃত্যুর পরিসংখ্যান। অর্থাৎ যেসব অসুখে দেশের বেশির-ভাগ লোক আক্রান্ত হন বা মারা পড়েন, সেইসব মৃত্যুকে প্রতিরোধ করতে যেসব ওষুধের প্রয়োজন সেইগুলিকেই অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে তৈরি করার ব্যবস্থা নেওয়াই ভেষজনীতি নির্ধারণের প্রাথমিক কর্তব্য হওয়া উচিত। আমাদের দেশের বর্তমান ভেষজনীতি, দেশের বর্তমান রোগ-মৃত্যুর পরিসংখ্যানের ওপর ভিত্তি করে রচিত হয় না। কেন্দ্রে স্বাস্থ্য-মন্ত্রকের পরিবর্তে শিল্পমন্ত্রক ভেষজনীতি প্রণয়ন করে থাকেন। সুতরাং ওষুধের উৎপাদন প্রয়োজনভিত্তিক না হয়ে মুনাফাভিত্তিক হয়। যে ওষুধ বিক্রি করে যত বেশি মুনাফা, আমাদের দেশের সেইসব ওষুধের উৎপাদন তত প্রাধান্য পেয়ে থাকে। এইসব ওষুধের অধিকাংশই অপ্রয়োজনীয়, এমনকি ক্ষতিকর। বলাই বাহুল্য, এগুলির উৎপাদন এবং বিক্রি বন্ধ করতে না পারলে প্রয়োজনীয় এবং জীবন-দায়ী ওষুধের পর্যাপ্ত উৎপাদন কখনোই সম্ভব নয়।

ওষুধের উৎপাদনের ব্যবস্থা করাই যথেষ্ট নয়, উৎপাদিত ওষুধ কিভাবে ভোক্তার কাছে পৌঁছবে, বিশেষ করে যাঁদের ক্রয়ক্ষমতা নেই তাঁরা কী করে ওষুধ পাবেন, তার উপায়নির্ধারণ ভেষজনীতিতে থাকা আবশ্যিক। উৎপন্ন ওষুধের গুণমান কিভাবে বজায় থাকবে—নিম্নমানের অথবা ভেজাল ওষুধ যাতে উৎপন্ন বা বিক্রি না হয় তার ব্যবস্থার উল্লেখ ভেষজনীতিতে থাকা প্রয়োজন। আমাদের দেশের ক্ষেত্রে এ ব্যাপারে সতর্কতা অত্যন্ত জরুরি, কারণ এখানে চালু ওষুধের ২০ ভাগ নিম্নমানের অথবা ভেজাল। বেসরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী, প্রায় ৫০ শতাংশ ওষুধই হয় ভেজাল নয় নিম্নমানের।

ওষুধ সম্বন্ধে সুস্থ বিপণননীতি প্রণয়নও দেশীয় সরকারের গুরুতর দায়িত্ব। চাল-ডাল-তেল-পাউ-ডারের মতো ওষুধও আমাদের দেশে একটি ভোগ্য-পণ্য। অন্যান্য ভোগ্যপণ্যের থেকে ওষুধের পার্থক্য একটাই—সাবান-স্নো-পাউডারের ক্ষেত্রে পণ্য প্রস্তুত-কারক ভোক্তাকে আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যে সরাসরি ক্রেতার কাছে নানা মাধ্যমে প্রচার চালায়। ওষুধের বেলায় সরাসরি ভোক্তার কাছে হাজির না হয়ে পণ্য-প্রস্তুতকারক সংস্থার এজেনটরা উপস্থিত হয় ডাকতারদের কাছে। নানা কায়দায় সত্য, অর্ধসত্য এমনকি মিথ্যা তথ্যের মাধ্যমে পণ্যের (ওষুধের) গুণাবলী ডাকতারদের বুঝিয়ে ওষুধ-ব্যবসায়ীরা বিক্রি সুনিশ্চিত করে, বৃদ্ধি করে। উন্নত দেশে কিন্তু ব্যবস্থাটা অন্যরকম। সরকারি ব্যবস্থাপনাতেই সেখানে ওষুধের প্রকৃত তথ্য ডাকতারদের কাছে প্রেরণ করা হয়। আমাদের মতো তৃতীয় বিশ্বের অন্তর্গত দেশ-গুলিতে ওষুধ-কোমপানিগুলির সরবরাহ করা তথ্যের ওপর ভিত্তি করা ছাড়া ডাকতারদের গত্যন্তর নেই। এখন এই অবস্থায় ওষুধ-সম্পর্কিত যাবতীয় প্রকৃত তথ্য ডাকতারদের কাছে প্রেরণের প্রণালীর উল্লেখ থাকা ওষুধ-নীতিতে অবশ্যই প্রয়োজন ; এ ছাড়াও প্রয়োজন, ওষুধ-কোমপানিগুলির লাগামছাড়া প্রচারের সীমারেখা নির্দিষ্ট করে দেওয়া। প্রয়োজন, বিদেশের মতো সরকার-গঠিত এমন একটি সংস্থা ; যার মাধ্যমে প্রচারে ব্যবহৃত পত্রপুস্তিকার তথ্যগুলি যথাযথভাবে যাচাই করে নেওয়া সম্ভব। বিভিন্ন প্রচার-মাধ্যমে—যথা রেডিও, টি-ভি, সংবাদপত্রে—

ব্যবহৃত ওষুধ সম্বন্ধে বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রেও এই সতর্কতামূলক ব্যবস্থাটি অনুসরণ করা বিশেষভাবে জরুরি। ভেষজনীতি লঙ্ঘিত হচ্ছে কিনা, তা লক্ষ করা এবং ভঙ্গকারীর শাস্তি বিধানের ব্যবস্থা করাটাও ভেষজনীতি প্রণয়নের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। এই ত্রুটিগুলি অন্বেষণ এবং তার প্রতিকারের ব্যবস্থা না করলে সে নীতি যথার্থই অনর্থক। ভেষজনীতির আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হওয়া উচিত—ভেষজ-শিল্পে স্বয়ম্ভরতা অর্জনের লক্ষ্য সুনির্দিষ্ট করা। ভারতে নয় হাজারেরও বেশি ওষুধ-কোমপানির মধ্যে মাত্র পাঁচটি সরকারি কোমপানি সহ ২৫০টি হল বৃহৎ সংস্থার (লারজ-স্কেল ইউনিট) পর্যায়ভুক্ত। যার মধ্যে দেশী আর বিদেশী দু ধরনের কোমপানি আছে। অবশিষ্ট ৮৭৫০টি ওষুধ-কোমপানি হল ক্ষুদ্র-শিল্পের অন্তর্ভুক্ত। সংশ্লিষ্ট বিশ্বসংস্থা ইউনিডোর মতে, ভারতের যে কারিগরি জ্ঞান এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা আছে তাতে ওষুধ-শিল্পের পক্ষে ১০০ শতাংশ স্বয়ম্ভরতা অর্জন করা অসম্ভব নয়। অথচ ওষুধের বাজারের সিংহভাগ রয়েছে বিদেশী বহুজাতিক কোমপানিগুলির দখলে। সুতরাং জাতীয় ভেষজনীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় গবেষণা আর প্রযুক্তির বিকাশ ঘটিয়ে কিভাবে দেশীয় কোমপানিগুলি স্বাবলম্বী হতে পারে, এবং প্রয়োজনীয় ওষুধ পর্যাপ্ত পরিমাণে সরবরাহের ব্যাপারে সমর্থ হতে পারে সে পরিকল্পনা ও সহায়তাও সরকারি স্তরে থাকা উচিত।

জাতীয় ভেষজনীতি নিয়ে আলোচনার পরিশেষে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, দেশের বর্তমান ওষুধ-নীতির অসম্পূর্ণতাগুলি উল্লেখ করে একটি গণমুখী ও বৈজ্ঞানিক ভেষজনীতি কী ধরনের হওয়া উচিত, তার একটি খসড়া পশ্চিমবঙ্গ ড্রাগ অ্যাকশন ফোরাম সহ ভারতের অন্যান্য রাজ্যের সংস্থার প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত সারাভারত ড্রাগ-অ্যাকশন নেটওয়ার্কের তরফ থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের রসায়ন এবং সার ও স্বাস্থ্যমন্ত্রীর কাছে পেশ করা হয়েছে। বিভিন্ন সভা এবং প্রচার-মাধ্যমে ভেষজনীতি সম্পর্কে সর্বভারতীয় সংস্থার বক্তব্য তুলে ধরা হয়েছে। সাম্প্রতিক একটি খবরে প্রকাশ পেয়েছে, বিষয়টি প্রধানমন্ত্রীর নজরে এসেছে এবং তিনি আগামী নতুন ভেষজনীতি ঘোষণা আপাতত স্থগিত রেখে সংশ্লিষ্ট সকলের সাথে আলোচনার মাধ্যমে ভেষজনীতি নির্ধারণের আশ্বাস দিয়েছেন।

অলীক মানুষ

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

এগারো

বদিউজ্জামান শুধু বলেছিলেন, আমি সবই জানতাম। আর এই থেকে গুজব ছড়িয়ে পড়ে, মধ্যরাতে দরিয়াবানু যখন ডুমুরগাছে ঝুলতে যাচ্ছে, তখন পিরসাহেবের অনুগত এক জিন ছুটে এসে খবর দিয়েছিল। জিনটি বলেছিল, আত্মহত্যাকারীদের প্রতি খোদার লানৎ (অভিশাপ)! পিরসাহেবের সঙ্গে জিনটির তুমুল তর্কাতর্কি হয়ে যায়। পিরসাহেবের মতে, আল্লাহ দোজখের একাংশ খালি রেখেছেন আত্মহত্যাকারীদের জন্য। কাজেই আল্লাহের ইচ্ছা পূর্ণ হোক। ক্ষুব্ধ জিনটি পরে আলোর বেগে অকুস্থলে পৌঁছেও দরিয়াবানুকে আটকাতে পারে নি। সে স্তম্ভিত হয়ে দেখে, ডুমুরগাছটিকে পাহারা দিচ্ছে একদল কালো জিন। সেই জ্যোৎস্নারাতে একটা কালো দেয়ালের ভেতর নাদান এক স্ত্রীমানুষের মৃত্যু হচ্ছিল। ব্যথিত জিন ফিরে এসে পিরসাহেবকে ধ্যানস্থ দেখতে পায় এবং আসমানের দ্বিতীয় স্তরে নিজের দেশে চলে যায়। আর সে কোনোদিন ভুলেও পৃথিবীর মাটিতে পা রাখে নি।

জিনটির সঙ্গে বদিউজ্জামানের তর্কাতর্কি শুনেছিল মসজিদ-সংলগ্ন একটি বাড়ির বুড়ো-বুড়িরা। তারা জেগেই রাত কাটায়। তারাই সাক্ষ্য দিয়েছিল, পিরসাহেব বেয়ানের মরতে যাওয়ার কথা জানতে পেরেছিলেন। জিনটি চলে যাওয়ার সময় নিমগাছে আলোর ঝলকও দেখেছিল তারা। সাংঘাতিক কিছু ঘটতে চলেছে ভেবে তারা ভোরের প্রতীক্ষায় রাত কাটাচ্ছিল।

সকালে মৌলাহাট থেকে খবর এলে হুলুস্থুল পড়ে যায়। পিরসাহেবের বেয়ানের অত্যদ্ভুত মরণ-ঝাঁপের একটা উপযুক্ত ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা চলে। তবে বদিউজ্জামান ভারি একটা শ্বাসের সঙ্গে শুধু এই বাক্যটি উচ্চারণ করেন, আমি সবই জানতাম।

ইসলামে আত্মহত্যাকারীদের ক্ষমা নেই এবং

নিশ্চিত অনন্ত দোজখ। আসলে শয়তান তার কালো জিনের বাহিনী নিয়ে যখন কাউকে ঘিরে দাঁড়ায়, তখন কিছু-কিছু ক্ষেত্রে তার জয়লাভ ঐশী নিয়মের অধীন। নইলে আল্লাহ যে হাবিয়া থেকে জাহান্নাম পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে বড়ো থেকে ছোটো সাতটি দোজখ প্রস্তুত রেখেছেন, তা পূর্ণ হবে কেমন করে?

শিসগাঁয়ের মসজিদের খতিব, যিনি জুম্মাবারে খুৎবা পাঠ করতেন, সেই হোসেন মোল্লার এই ব্যাখ্যা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। এর ফলে কোনো মুসলমানের মৃত্যুসংবাদ শুনে যে 'ইন্না লিল্লাহে ওয়াইন্না আলাইহে রাজেউন' দোয়াটি মৃতের আত্মার শান্তির জন্য উচ্চারিত হয়, হতভাগিনী দরিয়াবানুর জন্য তা হয় নি। আর পিরসাহেবের মুখে এক সাংঘাতিক গাম্ভীর্য। তাঁর উজ্জ্বল ফরসা রঙ নিষ্প্রভ দেখাচ্ছিল। মৌলাহাটের লোকটি অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পর ক্ষুব্ধভাবে ফিরে যায়। সে আশা করেছিল, পিরসাহেবের সঙ্গে গোরুর গাড়ি চেপে বাড়ি ফিরবে। যতক্ষণ না উনি বেয়ানের এই ভয়ঙ্কর পাপের জন্য আল্লাহের কাছে ক্ষমা চাইছেন, স্ত্রীলোকটির যে পরিত্রাণ নেই! শুধু সে নয়, মৌলাহাটের সব মানুষই পথ চেয়ে মাঠের দিকে তাকিয়ে ছিল। আশা করেছিল, দরিয়াবানুর লাসের সামনে জানাজানামাজে পিরসাহেবকে দাঁড়ানো দেখবে। কিন্তু তিনি যান নি। পরে সাব্যস্ত হয়, ফরাজি মৌলানার পক্ষে কোনো আত্মহত্যাকারিণীর লাসের জানাজায় দাঁড়ানো সম্ভবত নিষিদ্ধ।

কিন্তু এসবের চেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা বদিউজ্জামানের ক্রমাগত দূরাপসরণ। শিসগাঁ থেকে হাটুলি, হাটুলিতে দুটো দিন কাটিয়ে কাঁদরা, সেখান থেকে ভবানীপুর, তারপর মণিগ্রাম-বিনোটিয়া। উত্তর-পশ্চিম কোণে প্রায় সরলরেখায় অপসরণটি ঘটছিল। মণিগ্রামে আবার বাদশাহি সড়কের দেখা মেলে। সড়কের ধারে ঢ্যাঙা শিমুলের মাথায় তখন লাল ফুল। বসন্তঋতু আসন্ন। সেখান থেকে সড়ক ধরে দশ ক্রোশ দূরত্ব পেরিয়ে যথারীতি শিষ্যরা বস্তাভরা ধান, একটিন গুড় আর একবস্তা মসুরির ডাল পৌঁছে দিতে গিয়েছিল মৌলাহাটে।

সাইদা বেগমের বাড়ির দরজায় সারা মরশুম এভাবে শিষ্যরা গাড়িবোঝাই জিনিসপত্র পৌঁছে দিত। তারা বলত, হুজুরের তবিয়ত খোদার বরকতে ভালো। তারা একটু রহস্যময় হাসিও হাসত। বলত, আপনাদের হাল-হকিকত হুজুরের অজানা নাই। অর্থাৎ অনুগত শাদা জিনদের অদৃশ্য গতিবিধি সমানে চলেছে। হুরুজ্জামান তখন শ্বাশুড়ির বাড়ির মালিক। জোত-জমার মালিক। রোজি মায়ের মতো কোমরে আঁচল জড়িয়ে সংসার গুছিয়ে বসেছে। এ বাড়িতে মনিরুজ্জামান নড়বড় করে হেঁটে শিষ্যদের গাড়ির কাছে যায়। গোঙানো কণ্ঠস্বরে কথাবার্তা বলার চেষ্টা করে। দলিজঘরে ধান বা খন্দের বস্তা শিয়েরা তুলে দেওয়ার পর সে হুংকার দিয়ে মাটিতে ছড়িয়ে পড়া শস্যকণাগুলির দিকে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তবে এজন্য নুরির মা ঝাঁটা হাতে তৈরি থাকে। যত্ন করে খুঁটিয়ে সব ঝাড় দিয়ে স্তূপাকৃতি করে। আঁচলে বা কুলোয় তুলে নিয়ে যায়। যাওয়ার সময় একটু হেসে নুরির মা লোকগুলোকে জিগ্যেস করে, হুজুর কবে ফিরছেন? ওরা শুধু বলে, কী জানি! হুজুরের ইচ্ছে।

ফাল্গুন মাসে ধান বেচে সাইদা বউবিবি রুকুকে সোনার নথ বানিয়ে দিলেন। রোজি তার মায়ের সব গয়না পেয়েছিল। নিজে সবই পরে থাকত। কিন্তু রুকুর কথা যেন তার মনে পড়ত না। আয়মনি এসে রুকুকে সাইদার সামনে তাতাতে চাইত। রুকু গ্রাহ্য করত না। সাইদার সোনার নথ কিনে দেওয়ার পেছনে সেই ক্ষোভ ছিল। রুকু শাশুড়ির খাতিরে একটা দিন নথ পরেছিল মাত্র। তারপর আবার সেই শাদাসিদে বেশভূষা। উদাসীন হাঁটাচলা, চাউনি দূরে—বহু দূরে, গোঁড়াপীরের পোড়ো মাজারের বটগাছের শীর্ষে নীল-ধূসর আকাশের দিকে। সেখানে

কেউ উলটো দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে আছে।

আর সেই ফাল্গুন মাসে শিষ্যদের কাঁদিয়ে বদিউজ্জামান যখন মহুলায় যাবার জন্য গাড়িতে উঠতে যাচ্ছেন, সেই সময় মৌলাহাট থেকে টাট্টু ঘোড়ায় চেপে ক্লান্ত একটি লোক ভাঙা গলায় খবর দেয়, শেষ রাতে হুজুরের আত্মাজান ইন্তেকাল করেছেন। ইন্না লিল্লাহে ওয়াইন্না এলাইহে রাজেউন।

আশ্চর্য, বদিউজ্জামান বলেছিলেন, আল্লাহের ইচ্ছা! শিষ্যরা গাড়ির মুখ ঘোরাতে গেলে ভর্ৎসনা করে বলেছিলেন, অ্যাই নাফরমান খোদার বান্দা! তোমরা জান না মউতের জন্য শোক হারাম? প্রবাদ আছে, এরপর একটি অলৌকিক ঘটনা ঘটে মৌলাহাটে। কামরুন্নিসার জানাজা হতে সন্ধ্যা হয়ে যায়, কারণ দশ ক্রোশ দূর থেকে তাঁর পুত্রের পৌঁছুনোর অপেক্ষা করা হয়েছিল। আর সেই সন্ধ্যায় আকাশের উত্তর-পশ্চিম কোণে জমাট কালো মেঘ দেখা গিয়েছিল। আগাম একটা কালবোশেখির আশঙ্কা করছিল ওরা। ক্লান্ত লোকটি টাট্টু নিয়ে ফিরলে বিস্মিত মৌলাহাটবাসীরা গোরস্তানে লাস নিয়ে যায় এবং সেই সময় কালবোশেখি এসে পড়ে। জানাজার সময় আরও বিস্মিত হয়ে তারা দেখে, অবিকল হুজুরের মতো লম্বা-চওড়া এবং শাদা আলখেল্লা, সবুজ পাগড়িপরা একটি মানুষ আগের সারির সামনে লাসের কাছে দাঁড়িয়ে জানাজার নামাজ পড়ছেন। ধুলোর পরদার ভেতর ওই দৃশ্য, এমন-কি মেঘের গর্জনের ভেতর চেনা গম্ভীর কণ্ঠস্বরও কেউ-কেউ শুনেছিল। ছড়বড়িয়ে বৃষ্টির ফোঁটা এসে পড়লে তারা দ্রুত লাস কবরস্থ করে এবং মাটি চাপিয়ে চলে আসে। আসার সময় পিছু ফিরে কবরের দিকে তাকানো নিষিদ্ধ। কিন্তু কী খেয়ালে কেউ-কেউ তাকিয়েছিল। তাদের চোখে পড়ে লম্বাচওড়া মানুষটি কবরের দিকে ঝুঁকে কাদামাটি সযত্নে সমান করে দিচ্ছেন। শিলাবৃষ্টি শুরু না হলে তারা অন্য লোকেদের তখনই কথাটা বলত। তারা হলফ করে বলেছিল, বিদ্যুতের ঝিলিকে মানুষটিকে তারা স্পষ্ট দেখেছে এবং তিনিই হে হুজুর পিরসাহেব, তাতে কোনো ভুল নেই।

তখন বদিউজ্জামান মহুলার মসজিদে নামাজ পড়ছিলেন শিষ্যদের সামনে দাঁড়িয়ে। এই মসজিদটি ছিল ইটের তৈরি এবং নতুন। হুজুরকে দিয়ে মগরেবের (সন্ধ্যার প্রার্থনার) সময় এর দ্বারোদ্ঘাটন হয়। কালবোশেখি আর শিলাবৃষ্টির দৌরাত্ম্যের দরুন মসজিদপ্রাঙ্গণে যে ভোজসভার আয়োজন হয়েছিল, তাতে বাধা পড়ে। তবে ব্যাপারটা হাজি নসরুল্লার প্রকাণ্ড দলিজঘর আর বারান্দায় চুকে যেতে অসুবিধা হয় নি। তখন আর বৃষ্টি ছিল না। আকাশ পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু হুজুর কিছু মুখে তোলেন নি। বলেছিলেন, মউতের জন্য শোক হারাম। শোকে নয়, আমার তবিয়ত কাল থেকে ভালো নেই। শেষে অনেক সাধাসাধির পর শুধু একগ্লাস গুড়ের শরবত খেয়েছিলেন।

সে-রাতে মহুলার কিছু অসৎ কৌতূহলী যুবক জনহীন নতুন মসজিদে বহুপিরের সঙ্গে জিনের বাতচিত দেখার জন্য ওত পাততে যায়। তাদের একজনকে সাপে কামড়ায়। সে মারা পড়ে।

মহুলা নদীর তীরে বলে গ্রামটিরও নাম ছিল মহুলা। লোকগুলি ছিল দুর্ধর্ষ প্রকৃতির। প্রায় ষাট-ঘরের বসতি। কিছু অন্ত্যজ শ্রেণীর হিন্দুরও বসবাস ছিল। তারা ছিল মৎস্যজীবী। মুসলমান পিরকে তারাও খুব ভক্তিশ্রদ্ধা করত এবং যে-বাড়িতে পিরসাহেবের খাওয়ার দাওয়াত, গোঁজ নিয়ে সেই বাড়িতে তারা সেরা মাছটি পাঠিয়ে দিত। জুম্মাবারে তারা দল বেঁধে স্ত্রীপুত্রকন্যা নিয়ে মসজিদের বাইরে একটা গাবগাছের তলায় ভক্তিভরে বসে থাকত। অসুখের জন্য পিরসাহেবের মন্ত্রপুত জল ঘটিতে করে নিয়ে যেত। পিরসাহেবের দর্শন আর আশীর্বাদ চাইত। বদিউজ্জামান বেরিয়ে আসতেন। তারা ভূলুণ্ঠিত প্রণাম করায় ক্রুদ্ধ হয়ে বলতেন, অ্যাই বেঅকুফ! করছ কী তোমরা? আমি তোমাদের মতনই এক মানুষ।

মানুষ হয়ে মানুষের কাছে মাথা নোয়াতে নেই। নোয়াবে শুধু ওই আল্লাহের কাছে।

তারা কুণ্ঠিতভাবে জড়োসড়ো হয়ে তাকিয়ে থাকত। আসলে তারা এই মুসলিম 'পির'কে ভাবত এক অলৌকিক শক্তিধর পুরুষ। তারা তাঁর কাছে যাচ্ঞা করতে আসত নদীর সঙ্গে লড়াই করার শক্তি। নদীটি ছোট্ট হলেও তার নিষ্ঠুরতা ছিল অসামান্য। বর্ষার পর থেকে তার হিংস্রতা যেত বেড়ে। এপাড়ের বাঁধ ভেঙে কতবার সে সর্বনাশী হয়ে ঘরসংসার ভাসিয়ে দিয়েছে লোকের। হাজি নসরুল্লাও বহুপিরকে এনেছিলেন এর একটা হিল্লে করতেই। নসরুল্লা আড়ালে মুচকি হেসে বলতেন, আর ডর নাই বাছারা! হুজুর বাঁধে হেঁটেছেন, বাঁধ পাথর হয়ে গেছে।

বদিউজ্জামান যতদিন মহুলায় ছিলেন, প্রতি-বিকেলে অভ্যাসমতো বেড়াতে বেরুতেন। নিষেধ থাকায় কেউ তাঁর সঙ্গে যেত না—যেতে চাইত না। ওঁকে একা রাখতে চাইত। আর হুজুর তাঁর ময়ূর-মুখো ছড়িটি নিয়ে বাঁধ ধরে বহুদূর হেঁটে যেতেন। বিকেলে কোনো ঘাসজমিতে একা 'আসরে'র নামাজ পড়ে নিতেন। 'মগরেবে'র সময় ফিরে আসতেন মসজিদে। একদিন ফেরার পথে বাঁধের ওপর ফণা-তোলা একটি সাপের মাথায় ছড়ির ঘা মারেন বদি-উজ্জামান। সাপটি সঙ্গে-সঙ্গে মারা পড়ে। সেই মরা সাপ ছড়িতে ঝুলিয়ে তিনি গাঁয়ে ফেরেন। খুব ভিড় জমে যায়। সাপটিকে আগুন জ্বেলে পোড়ানো হয়। গুজব রটে যায়, এই সেই শয়তান সাপ, যে নুহু নামে এক যুবককে কামড়েছিল। তবে তার চেয়ে বড়ো ঘটনা 'বাঁধের পাথর হয়ে যাওয়া'। প্রতি বিকেলে মহুলার পুবে বা পশ্চিমে হুজুর নদীতীরে বাঁধ বরাবর হেঁটে যান, প্রতি সকালে বাঁধটি পরীক্ষিত হয়। লোকেরা বাঁধটির দিকে মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে থাকে। বদ্ধমূল বিশ্বাস জন্মাতে থাকে, এই শাদা আর ধূসর মাটির বাঁধ অবশ্যই পাথরে পরিণত হতে চলেছে। হাজি নসরুল্লা চাপাস্বরে বলতেন, আল্লার ইচ্ছায় আর হপ্তাটাক। হপ্তাটাক ওঁয়ার জুতো খেলেই ব্যাটা শায়েস্তা হয়ে যাবে।

হয়ে যেত। বাধা পড়ে গেল। এক সন্ধ্যায় মগরেবের নমাজের পর মসজিদপ্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে প্রবীণেরা চাপা স্বরে চাষবাসের গল্প করছে, বদি-উজ্জামান মসজিদের ভেতর রেড়ির তেলের আলোয় ফারসি শাস্ত্র খুলে বসেছেন, হঠাৎ একটা কালোরঙের ঘোড়া আঁধার ফুড়ে বেরিয়ে এল। লোকগুলো ভ্যাবা-চ্যাকা খেয়েছিল। ঘোড়াটি উঁচু। মহুলায় এক সময় হাজি নসরুল্লার একটি ঘোড়া ছিল বটে, কিন্তু সেটি নিছক টাট্টু। তার পিঠে ছেলেপুলেরা যখন-তখন চেপে বেড়াত। ছোটানোর চেষ্টা করত। এই করতে গিয়ে বাঁধ থেকে বেচারি টাট্টু সোজা নদীতে পড়ে যায়। নদীতে স্রোত ছিল। সে ভেসে যায় এবং পরে তার মড়া পাওয়া গিয়েছিল বহু দূরের এক বাঁকের মুখে। শেয়ালেরা তাকে টেনে চড়ায় তুলেছিল। এক বেলাতেই তার মাংস ফুরিয়ে যায় এবং শকুনেরা নাকি ঠোঁট চেটে শেয়ালগুলোকে গাল দিতে-দিতে আকাশে উড়ে যায়। এই গল্পটা খুব রসিয়ে বলতে পারত হুজু, সেই সাপেকাটা যুবকটি। সন্ধ্যার অভাবিত এই উঁচু ঘোড়াটি দেখলে রসিক যুবক অন্য কোনো গল্প বানিয়ে নিতে পারত। ঘোড়ার সওয়ারকে নিয়েও তুখোড় একটি গল্প ফাঁদতে পারত সে। কারণ এমন ঘোড়সওয়ারও এ তল্লাটে কেউ কখনও ছ্যাখে নি। গম্ভীর কণ্ঠস্বরে সেই ঘোড়সওয়ার বলেছিলেন, এটা কি মহুলা?

লোকগুলো আড়ষ্টভাবে জবাব দিল, জি হ্যাঁ। এটাই মহুলা বটে।

এখানে কি মৌলাহাটের পিরসাহেব আছেন?

তারা একসঙ্গে হল্লা করে বলল, আছেন, আছেন। হুজুর আছেন।

সেই সময় কালো ঘোড়াটি হ্রেষাধ্বনি করল। কেন যেন ভয় পেয়ে হঠাৎ লাফিয়ে উঠেছিল সে। সামনেকার দুই ঠ্যাং তুলে অন্য ধারে ঘুরে দাঁড়াতে

চাইছিল। তাকে শান্ত করার পর সওয়ার নামলেন। ঘোড়াটি তখন স্থির দাঁড়িয়ে রইল। তার চোয়ালে একবার হাত বুলিয়ে সওয়ার মসজিদের দিকে এগিয়ে গেলেন। সম্ভাষণ করলেন, আস্সালামু আলাইকুম।

ওয়া আলাইকুম আস্সালাম।

বারান্দার চুনকামকরা থামের কাছে এসে দাঁড়িয়ে ছিলেন বদিউজ্জামান। ঘোড়ার আওয়াজ শুনেই তিনি চমকে উঠেছিলেন। আগন্তুক করমর্দনের জন্য হাত বাড়ালে তিনি দুহাতে হাতখানি গ্রহণ করলেন। তাঁর মনে ঝড় শুরু হয়েছিল। অতিকষ্টে দমন করে আস্তে বললেন, ভেতরে আসুন দেওয়ানসাহেব।

দেওয়ান আব্দুল বারি চৌধুরী নাগরাজুতো খুলে বারান্দায় উঠলেন। তাঁর বাঁ হাতে বন্দুক ছিল। বন্দুকটি নিয়ে খোদার ঘরের ভেতরে ঢোকা উচিত হবে কি না ভেবে একটু দ্বিধায় পড়েছিলেন। সেটা লক্ষ করে বদিউজ্জামান একটু হেসে বললেন, নিয়ে আসুন। ইসলাম কালাম (ঐশী বিদ্যা) আর হাতিয়ার দুই-কেই সমান ইজ্জত দেয়। আমার রসুলে করিম (সাঃ) নিজে হাতিয়ার ধরে লড়াই করেছিলেন। আসুন।

কিন্তু তাঁর মনে ঝড় উঠেছিল। হঠাৎ এই অজ পাড়াগাঁয়ে দেওয়ানসাহেব এভাবে এসে পড়েছেন, নিশ্চয় তার কোনো মজবুত কারণ আছে। বদি-উজ্জামান গালিচার একাংশ দেখিয়ে বললেন, বসুন। বারি চৌধুরি গালিচায় বসলেন না। নগ্ন চুনকাক্রিটের মেঝেয় বসে পড়লেন। তাঁকে ভীষণ গম্ভীর দেখাচ্ছিল।

বদিউজ্জামান গালিচায় বসে তাঁকে দেখতে-দেখতে বললেন, কোনো জরুরি খবর আছে দেওয়ান-সাহেব?

বারি মিয়াঁ আস্তে বললেন, ভেবেছিলাম আমাকে চিনতে পারবেন না।

বদিউজ্জামান মুখে সরল হাসির ছটা তুলে বললেন, আল্লাহের দুনিয়ায় কিছু-কিছু চেহারা মনে খোদাই করে রাখার মতো।

আমি গোনাহ্গার মানুষ পিরসাহেব! আমার তারিফ করবেন না। বারি মিয়াঁ হাসবার চেষ্টা করে বললেন। হরিণমারার ছোটোগাজির মুখে আমার কুফ্রি (বিধর্মিস্থলভ) চালচলনের কথা শুনে থাকবেন। যাই হোক, আপনার খোঁজে আজ প্রায় সারাটা দিন কেটে গেছে! আমার বরাত! আপনার দেখা পেলাম অবশেষে।

বদিউজ্জামান গম্ভীর হয়ে বললেন, খবর বলুন দেওয়ানসাহেব।

আপনি শফির খবর রাখেন?

বদিউজ্জামান চমকে উঠলেন। নিষ্পলক দৃষ্টে তাকিয়ে বললেন, শফির খবর! সে তো আপনার রাখার কথা। কেন দেওয়ানসাহেব?

শফির সঙ্গে আপনার দেখা হয় নি? আপনার কাছে আসে নি সে?

না। কেন—কী হয়েছে তার?

বারি মিয়াঁ গলার ভেতর বললেন, প্রায় সাতদিন হতে চলল, তার পাত্তা নেই।

বদিউজ্জামান ঝুঁকে এলেন তাঁর দিকে। তাঁকে ক্রুদ্ধ দেখাচ্ছিল। শ্বাসপ্রশ্বাসজড়ানো গলায় বললেন, কেন পাত্তা নেই? তাকে আমি আপনার হাতে তুলে দিয়েছিলাম। আপনি তার জিম্মাদার। আর আজ আপনি আমার কাছে তার খবর নিতে এসেছেন! তাজ্জব!

বারি মিয়াঁ মৃদুস্বরে বললেন, ওকে লালবাগে নিয়ে গিয়েছিলাম। হরিণমারা স্কুলে থাকলে ওর পড়াশোনা হবে না ভেবে কাছে রেখেছিলাম। নবাব বাহাদুর ইন্সটিটিউশনে বাইরের ছেলেদের ভরতি করে না। ওটা নবাব ফ্যামিলির প্রাইভেট স্কুল। তো—

বদিউজ্জামান প্রায় গর্জন করে উঠলেন, কুফ্রি বাত ছাড়ুন। সাফ-সাফ বলুন, কেন শফি চলে এল?

মাথা নেড়ে দুঃখিত স্বরে বারি মিয়াঁ বললেন, সেটাই বুঝতে পারছি না। হঠাৎ অমন করে চলে আসার পর আমি মৌলাহাটে গেলাম। গিয়ে শুনি, রোজি-রুকুর মা স্যুইসাইড করেছে। শফি সেখানে

যায় নি। আবার ছুটে গেলাম হরিণমারায় বড়ো-গাজির কাছে। খোনকারসাহেবের কাছেও গেলাম। শফি যায় নি। তারপর ভাবলাম, আপনার কাছে এসেছে নাকি।

বদিউজ্জামান চুপ করে থাকলেন। মুখটা নীচু। পিদিমের সামান্য আলোয় তাঁর চোখদুটি চিকচিক করছিল। বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর ভাঙা গলায় বললনে, আপনি শফির জিম্মাদার! তার ভালো-মন্দের সব দায় আপনার।

জি হ্যাঁ।

শফিকে আমি আংরেজি কালাম শিখতে দিয়েছিলাম! বদিউজ্জামান আবেগপ্রবণ মানুষ। এই কথাটি বলেই অবোধ বালকের মতো ফুঁপিয়ে উঠলেন। শয়তান আমাকে জাদু করেছিল। হা আল্লাহ! সেই গোনাহগারির এই খেসারত!

প্রার্থনায়, ভাষণে, মজলিশে উদাত্ত কণ্ঠস্বরে পবিত্র বাক্য আবৃত্তি করতে-করতে হুজুর পিরসাহেবকে তাঁর সব শিষ্যই এভাবে কাঁদতে দেখেছে। মহুলার শিষ্যরা ততক্ষণে ভিড় করে এসে বারান্দায় দাঁড়িয়েছে। তারা ভেতরে ঢুকতে ভরসা পাচ্ছে না। বাইরে গ্রামের পথে গাবগাছটার তলায় ঘোড়াটা তেমনি স্থির দাঁড়িয়ে আছে। এতক্ষণে নদীর ওপারের আকাশে প্রকাণ্ড জালার মতো মেটেরঙের চাঁদটা উঠছিল। সেই পাংশু ছটায় কালো ঘোড়াটিকে অলীক দেখাচ্ছিল—যেন এক পক্ষিরাজ। মেয়েরা একটু দূরে পিদিম হাতে দাঁড়িয়ে ওই অলৌকিককে প্রাণ ভরে উপভোগ করছিল। তাদের কেউ-কেউ হাসাহাসি করে বলছিল, নুহু বেঁচে থাকলে বড়ো মজা হত। মজাটা কী হত, বলা কঠিন। তবে নুহু নিশ্চই ওই আশ্চর্য প্রাণীটির সঙ্গে কথাবার্তা বলতে পারত।

বাইরে চটুল এবং চাপা হাস্যপরিহাস, ভেতরে ক্রন্দন। বিব্রতমুখে বারি মিঁয়া বললেন, হুজুর পিরসাহেব! আপনি বুজুর্গআলেম। এই সামান্য ব্যাপারে আপনার অস্থির হওয়া শোভা পায় না। আমি শুধু দেখতে এসেছিলাম, শফি আপনার কাছে এসেছে কি-না।

সবুজ পাগড়ির প্রান্ত নাকে চোখে ঘষে বদিউজ্জামান সংযত হলেন এবার। ভাঙা গলায় বললেন, আপনি শফির আম্মার সঙ্গে দেখা করেছেন?

জি হ্যাঁ।

তিনি কী বলছেন?

পদ্মার ধারে ভগবানগোলার ওদিকে ওঁর ভাইয়ের বাড়ি। সেখানে গিয়ে থাকতে পারে!

যাবে না। বদিউজ্জামান গলার ভেতর বললেন। যায় নি।

কেন?

শফির মামুজি এক শয়তান। নেশাভাং করে। খুদ জাহান্নামি শয়তান সে।

তবু একবার দেখে আসব। বারি চৌধুরি উঠে দাঁড়ালেন।···ঠিকানা নাম সবকিছু লিখে নিয়েছি শফির মায়ের কাছে।

বলেই বন্দুকটি কাঁধে তুলে নিয়ে সোজা বেরিয়ে গেলেন। বদিউজ্জামান তাঁকে রাতের মেহমানির কথা বলার সুযোগই পেলেন না।

বাইরের ভিড় দেখল, কালো ঘোড়াটি কী ভাবে মুছে গেল—যেন পিছলে চলে গেল হলুদ জ্যোৎস্নার গা বেয়ে। তারপর বহুক্ষণ শুকনো মাটিতে খুরের শব্দ হতে থাকল খট্ খট্ খটাখট্···খট্ খট্ খটাখট্···

মসজিদের বারান্দা থেকে কুণ্ঠিত মুখগুলি উঁকি দিচ্ছিল। বদিউজ্জামান গলা ছেড়ে ডাকলেন, হাজিসাহেব আছেন কি?

কেউ বলল, হাজিসাহেব নদীর পারে গেছেন ভুঁই দেখতে। খবর দিই হুজুর?

জি। জলদি খবর ভেজুন।

সে ছুটে বেরিয়ে গেল। নদীর ওপরে বোরো-ধানের জমিতে কোথায় মুনিশেরা সেচ দিচ্ছে রাতভর এবং হাজি নসরুল্লা তার তদারক করছেন, সে জানে।···

হুজুরের তলব পেয়ে হাজি নসরুল্লা কাদা ধোওয়ার কথা ভুলে হাঁফাতে-হাঁফাতে গাঁয়ে ফিরেছিলেন। ফতুয়া লুঙ্গি আর টুপিতে প্রচুর কাদা। মসজিদের বারান্দায় উঠেই তিনি থ। ভেতরে মুসল্লি প্রবীণেরা কেঁদে ভাসিয়ে দিচ্ছেন। হুজুর হাত তুলে তাদের সান্ত্বনা দিচ্ছেন। ব্যাপারটা কী, বুঝতেই সময় লেগেছিল। তারপর যখন শুনলেন, হুজুর এখনই তাঁদের ছেড়ে চলে যাবেন এবং গাড়ি সাজাতে বলেছেন, তিনিও বিকট শব্দ করে কেঁদে উঠলেন। বদিউজ্জামান বললেন, তওবা! নাউজুবিল্লাহ! আপনারা কি নাদান, না বেঅকুফ?

হাজি নসরুল্লা ভেতরে ঢুকে পায়ের কাছে আছড়ে পড়লেন। বিদায়ের সময় এটা চিরাচরিত রীতি বা দৃশ্য। কিন্তু বদিউজ্জামান বুঝতে পারছিলেন, মহুলার এই মানুষগুলো একেবারে আলাদা রকমের। কথায়-কথায় এরা যেমন খুনোখুনি করতে পারে, তেমনি কেঁদে বান ডাকিয়েও দেয়। অন্যান্য ক্ষেত্রে তিনি এ ব্যাপারটা সহজভাবে নিয়েছেন। নিজেও প্রচুর কান্নাকাটি করেছেন। কিন্তু সে-মুহূর্তে তাঁর অসহ্য লাগছিল। তিনি শেষে ক্রুদ্ধ ভাবে উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, এখনই গাড়ির ইন্তেজাম না হলে আমি পায়দল রওনা হব! বলুন আপনারা, কী চান?

হাজি নসরুল্লা চোখ মুছে বললেন, তাই হবে হুজুর! আগে দুমুঠো খানা তো খেয়ে নেন। একবার নামাজের পর গাড়ি ছাড়বে। ইনশাল্লাহ্!

মহুলায় একমাস পরে আবার আসার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বেরুতে পেরেছিলেন বদিউজ্জামান। মহুলা থেকে কোনো রাস্তা নেই। মাঠের জমির আল কেটে দুফালি চাকাগড়ানো 'লিক'-রাস্তা করা হয় শুখার কয়েকটা মাস। বর্ষায় কাটা আলগুলো বুজিয়ে জমিতে জল ধরে রাখে চাষীরা। তারপর সেই শীতে ধানকাটা হয়ে গেলে আবার লিক-রাস্তাটা গড়ে ওঠে ক্রমশ। সেই লিক-রাস্তা ধরে দুক্রোশ এগিয়ে তবে বাদশাহি সড়ক। মৌলাহাট দশ ক্রোশ দূরত্ব। পৌঁছুতে পরদিন সন্ধ্যা হওয়ার কথা। কিন্তু খবর ছোটে বাতাসের আগে। সারা রাস্তায় যত গ্রাম, ততবার অলৌকিক শক্তিধর—বুজুর্গ-পুরুষ বহুপিরের গাড়ির সামনে এসে দাঁড়ায় জনতা। হানাফি ফরাজি কোনো বাছাবাছি নেই। ততদিনে বহুপির মজহাব্ বা সম্প্রদায়ের ঊর্ধ্বে পৌঁছে গিয়েছিলেন। প্রতি গ্রামে তাঁর গাড়ি পৌঁছয়, দেখা যায়, আগে থেকে খবর পেয়ে প্রস্তুত মুসলমান-জনতা রাস্তায় অপেক্ষা করছে। এমন-কী হিন্দুরাও তাঁকে উদ্দেশ করে কপালে হাত ঠেকায়। গাড়ি ছিল দুটি। একটিতে তিনি, পেছনেরটিতে কয়েকজন মহুলাবাসী শিষ্য ধান-খদ্দের কয়েকটা বস্তা নিয়ে। তাদের সঙ্গে লাঠি-টাঙ্গি-বল্লম এবং একটা তলোয়ারও ছিল। বাদশাহি সড়কে রাহাজানি হয় প্রায়ই। তাই এই সতর্কতা। বদিউজ্জামান গাড়োয়ানের ঠিক পেছনে বসে ছিলেন, হাতে তসবিহ্ বা জপমালা। মাথায় সবুজ রেশমি পাগড়ির শীর্ষে শাদা ছুঁচলো টুপিটি দেখা যাচ্ছিল। পরনে ঢিলে শাদা আলখেল্লা। বাঁহাতের কড়ে আঙুলে চাঁদির মোটা আংটি—তবে ওটা নিছক আংটি নয়, তাঁর সিলমোহর। আরবিতে নিজের নাম খোদাই করা আছে। কাজললতার কালি মাখিয়ে কাগজে ছাপ দিলে সেটি শাস্ত্রীয় দলিল বলে গণ্য হয়। বহু বিবাদের নিষ্পত্তি, শরিকি সম্পত্তি বাঁটোয়ারা, কোনো জটিল সামাজিক ঘটনায় বা ব্যক্তিগত বিষয়ে 'ফতোয়া'র প্রামাণিকতা সিদ্ধ করে ওই চাঁদির আংটিটি। সারা রাস্তা সেবার তাঁর বড়ো বেশি দেরি করিয়ে দিচ্ছিল লোকেরা। দিনের নমাজগুলো কোনো-না-কোনো গ্রামের মসজিদে সেরে নিতে হচ্ছিল। আর নমাজ শেষ হলেও তাঁকে ওরা ছাড়তে চায় না। বহু সমস্যার ফয়সালা করে দিতে হয়। সিলমোহরের ছাপসহ 'ফতোয়া' লিখে দিতে হয় কাগজে। তবে প্রচুর সেলামি পড়ছিল। তাঁর আলখেল্লার একটি জেব টাকাকড়িতে ভরতি হয়ে গিয়েছিল।

অথচ মনে এতটুকু শান্তি ছিল না বদিউজ্জামানের।

অস্থির হয়ে ভাবছিলেন, এর চেয়ে যদি দেওয়ান-সাহেবের মতো তাঁর একটি তেজি ঘোড়া থাকত, তিনি পাখিওড়া পথে কখন পৌঁছে যেতেন মৌলা-হাটে। এতদিনে বুঝতে পারছিলেন, তিনি যেন একটা ফাঁদে আটকে গেছেন। এই ফাঁদকে ফাঁকি দিয়ে এড়িয়ে চলার জন্যই তিনি এক গ্রামে বেশিদিন বাস করতেন না। অথচ কী ভাবে খুব সহজেই ফাঁদে পড়ে গেলেন শেষ পর্যন্ত! এখন তাঁর দিকে প্রতি মুহূর্তে অসংখ্য অদৃশ্য চোখ—তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। একা হতে চান, একা বেরিয়ে পড়েন, তবু ওই তীক্ষ্ণ সজাগ ঝাঁকে ঝাঁকে চোখ পেছনে অলক্ষ্যে থেকে তাঁকে দেখে। আহারে নিদ্রায় ভ্রমণে প্রার্থনায় ধ্যানে শয়নে সর্বত্র সর্বদা যেন হাজার-হাজার চোখ তাঁর প্রতি নিবদ্ধ। নাদান বেঅকুফ! ওরা তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপে ও কাজে 'মোজেজা' অন্বেষণ করে। নিশীথ রাত্রির বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডকে অনুভব করার জন্য যখন তিনি খোলা আকাশের নীচে গিয়ে দাঁড়ান, ওরা ভাবে একটা মোজেজা ঘটতে চলেছে। তাঁর হাতের ময়ূরমুখো ছড়িটি দেখে ওরা কি ভাবে তিনি হজরত মুসার মতো দরিয়ার পানি দুভাগ করতে পারেন? উজবুগ, বুড়বক, গোমরাহ্!

হুজুর!

গাড়োয়ান ঘুরে তাকে প্রশ্ন করছিল। বদিউজ্জামান বলেছিলেন, কিছু না।

গাড়োয়ান হলুদ দাঁতে হেসে বলেছিল, আর এসে পড়েছি বলে! ইনশাল্লা! ফজরের নামাজ মৌলা-হাটের মসজিদেই পড়ব দেখবেন। আপনার মেহের-বানিতে, হুজুর, বলদ দুটো কেমন টগবগিয়ে পা ফেলছে দেখছেন?

এই বলে সে বলদ দুটোর লেজ খামচে বিকট চেঁচিয়ে উঠেছিল, ইররর হেট্ হেট্! লে লে লে··· হুদ্দে হুদ্দে হুদ্দে···

সইদা খবর পেয়েছিলেন আগের দিন সন্ধ্যায়। ইন্দ্রাণীর হাটে গিয়েছিল কারা, তারা খবরটা পায়—হুজুর মদনপুর থেকে রওনা দিয়েছেন। রুকু হিসেব করে বলেছিল, পৌঁছুতে রাত দুপুর হবে। মনিরুজ্জামান কিভাবে ব্যাপারটা আঁচ করে আগের মতো মুখে হাত ভরে আপনমনে খ্যা খ্যা করে হেসে উঠেছিল। সইদা বেগম নির্বিকার মুখে রান্না করছিলেন। মুরগির গোস্ত, খেজুরখড়ি চালের পোলাও, সেদ্ধ করে রাখা বাসি গোরুর গোস্তের কোপ্তা। সারা সন্ধ্যা রুকু শিলনোড়ায় গোস্তটা থেঁতলে নরম করেছিল। বাড়িতে কয়েকটা আলো এ রাতে। আয়মনি এসে-ছিল এশার নামাজের পর। পা ছড়িয়ে বারান্দায় বসে চাপাস্বরে রোজির সংসারের গল্প করছিল। শফির নিপাত্তা হওয়ার খবরে সে কান করে নি। বলেছিল, আছে কোনোখানে। বাপের স্বভাব। ঠিকই মা বলে ডেকে বাড়ি ঢুকবে। সইদা কোনো মন্তব্য করেন নি। দুদিন আগে দেওয়ানসাহেবকে আড়াল থেকে বলে দিয়েছেন, শফি আমার মরা ছেলে। ওর কথা আমার মনে পড়ে না দেওয়ানসাহেব।

এদিন শফির আব্বা আসবেন শুনে শফির কথাই বেশি করে মনে পড়ছিল সইদার। প্রস্তুত হচ্ছিলেন মনে-মনে, সামনে এসে দাঁড়ালেই জামা খামচে ধরে আকাশচেরা গলায় বলবেন, আমার শফিকে ফিরিয়ে এনে দাও! তোমার না জিনের পাল পোষা আছে, শুনি! বলো তাদের, এখনই এনে দিক আমার বুকের মানিককে! নইলে তোমার নিস্তার নেই!

রুকু দেখছিল, বিবিজি বারবার ঠোঁট কামড়ে ধরছেন। যেন কার সঙ্গে ঝগড়া করছেন। চোখ নিষ্পলক। নাসারন্ধ্র স্ফুরিত।

ছুখু শেখ দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে সাড়া দিচ্ছিল। মাজান! বিবিজান গো!

সইদা তাকে দেখা দেন না। আয়মনি কান করে শুনে ফিক করে হাসল। ওই গো, খবর হয়েছে!

না—এখনও খবর হয় নি। ছুখু শেখ জানিয়ে গেল, বানারিপুরে হুজুর এশার নামাজ পড়েছেন। আসতে ভোর হয়ে যাবে। দুদণ্ড বেলাও হতে পারে।

সাইদা শ্বাস ছেড়ে বললেন, বউবিবি! শোও গে যাও! আয়মনি, বাড়ি যাবি না শুবি আমার কাছে?

আয়মনি বলল, একটু দাঁড়ান বিবিজি! বাপ-জানকে বলে আসি।

আয়মনি বেরিয়ে যাওয়ার একটু পরে নুরুজ্জামান এল হন্তদন্ত। আম্মা! আম্মি! আব্বাসাব আসলেন? না।

নুরুজ্জামান উঠোনে দাঁড়িয়ে বলল, তাজ্জব।

উঠোনে চাঁদের আলো সবে পৌঁছেছে। কুয়োর কাছে রুকু কী একটা করছিল। নুরুজ্জামান দেখল, তার ভ্রাতৃবধূ হাতে বদনা নিয়ে টাট্টিঘরের দিকে চলেছে। সে মাঝখানের ঘরটার দিকে তাকাল। মনিরুজ্জামান তক্তাপোশের বিছানায় পা ঝুলিয়ে বসে খুব দুলছে। নুরুজ্জামান চোখ সরিয়ে নিল।

সাইদা বললেন, বসবি না নুরু?

নাঃ। যাই আম্মি! মসজিদ থেকে সোজা আসছি। শোচ করলাম কী, আব্বাসাব আসলেন নাকি দেখে যাই!

নুরুজ্জামান চলে গেলে সাইদা ক্ষুব্ধভাবে আপন মনে বললেন, চং! আব্বাসাব এলে মসজিদে খবর হবে না কী বাড়িতে খবর হবে! দুশমন—সব্বাই দুশমন!

রুকু বেরিয়ে বলল, কিছু বলছেন বিবিজি?

সাইদা গম্ভীর মুখে বললেন, না। শুয়ে পড়ো। রাত হয়েছে।

আয়মনিখালা আসুক।

সাইদা ধমক দিলেন, শোও তো তোমরা।

মনিরুজ্জামান গোঙানো গলায় যেন গান গাইবার চেষ্টা করছিল। ভুতুড়ে শব্দটা ভারি বিরক্তিকর। কিন্তু কেন মনি আজ এত খুশি, বুঝতে পারছিলেন না সাইদা। ওর আব্বা তো জন্ম দিয়েই খালাস। কোনোদিন ভুলেও কি তার দিকে একবার তাকিয়েছে? তাকালে কবে ও পুরোপুরি মানুষ হয়ে যেত।

সেই মুহূর্তে সাইদা বেগম আরও শক্ত হয়ে গেলেন।···

সে রাতে সাইদা চেয়েছিলেন মজবুত এক উদাসীনতা। প্রবলভাবে ঘুমোতে চেয়েছিলেন, এমন ঘুম যেন কেউ এসে ডাকাডাকি করে ফিরে যাক। কিন্তু উদাসীনতা, ঘুম বা শক্ত ভাবটা শেষ পর্যন্ত তিনি ধরে রাখতে পারেন নি। আয়মনি গাঢ় ঘুমে কাঠ। সাইদার ঘুম নেই। বাদশাহি সড়কে সারারাত গাড়ি চলার গড়গড় কোঁচ কোঁচ অদ্ভুত সব শব্দ হয়। মাঝে-মাঝে ভেসে আসে ঘুমঘুম গলায় গাড়োয়ানের গানের সুর। সে রাতে প্রতিটি শব্দের স্বাদ যাচাই করেছিলেন সাইদা। দূরের গাড়ির চাকার শব্দ শুনতে-শুনতে প্রতীক্ষা করছিলেন কখন শব্দটা এসে তাঁর খুব কাছে, হয়তো বা বুকের পাঁজরের কাছে এসে থেমে যাবে।

কিন্তু কোনো চাকার শব্দই থামল না। তাঁর বুক মাড়িয়ে মাথার খুলির ভেতর একটি গুরুভার গাড়ির ছুটি চাকা গড়িয়ে যেতে থাকল অনন্তকাল, আজীবন।

বদিউজ্জামানের খবর এল সকালে। ছুখু শেখ খবর এনেছিল। হুজুর পিরসাহেব ফজরের নামাজ পড়েছেন হরিণমারায়। ছোটো গাজি ছাড়েন নি। এবেলা হরিণমারায় থাকবেন। বিকেলে রওনা দেবেন। ছুখু শেখ হুজুরের আসন্ন প্রত্যাবর্তনের 'নমুদ' (সাক্ষ্য) হিসেবে একটি গোরুর গাড়িকে রাস্তা দেখিয়ে এনে-ছিল। গাড়িটিতে শস্তের বস্তা, জালাভরতি গুড়, কয়েকটা কুমড়ো। ছুখু সদর দরজার বাইরে থেকে চেঁচিয়ে ঘোষণা করছিল এইসব খবর। সাইদা তাকে দেখা দেন না। রুকু ঘোমটা টেনে দলিজঘরের দরজা খুলে দিল। তারপর সাইদা দেখলেন, মনিরুজ্জামান নড়বড় করে হেঁটে দলিজঘরের দিকে চলেছে। বুঝলেন, আব্বা কী নমুদ পাঠিয়েছেন, তা দেখার জন্যই যাচ্ছে সে। রুকু তার পাশ কাটিয়ে সরে এল। সাইদার ভুরু কুঁচকে গেল। তিনি জানেন, দরিয়াবানুর এই মেয়েটি তাঁর মেজো ছেলেকে ঘৃণা করে।

তখন বদিউজ্জামান হরিণমারায় গাজিদের দলিজ-

ঘরে বসে আছেন বড়োগাজির পালঙ্কে। ছোটোগাজি হুজুরের শিষ্য। খাসি কেটে ভোজসভার আয়োজনে ব্যস্ত। আর বড়োগাজি বিনীতভাবে একটা চেয়ারে বসে শাস্ত্র-আলোচনা করছেন পিরসাহেবের সঙ্গে। বলছেন, আপনি ঠিকই বলেছেন হুজুর। নাফরমানি-বেইমানির জন্যই মুসলমানের শাহি বরবাদ হয়েছে। আজ সে রাস্তার ফকির। আর আপনি ওই যে বললেন, ইংরেজ মুসলমানের দুশমন, সেও ঠিক। নানা ফিকিরে সে হিন্দুদের লড়িয়ে দিচ্ছে মুসলমানের সঙ্গে। তবে আমার মতে, হিন্দুদের সঙ্গে লড়ত হলে তাদের মতো ইংরেজিবিদ্যা শেখা এখন মুসলমানের ফরজ। এ বিষয়ে হুজুরের মত জানতে পারলে খুশি হই।

বদিউজ্জামান দেখামাত্র টের পেয়েছিলেন লোকটি ভণ্ড। তার এই ঘরভরতি বিলায়তি জিনিস, আংরেজি কেতাব! লোকটির চোখেমুখে চালাকি ঠিকরে বেরুচ্ছে। কিংবা এটা তার আংরেজি এলেমেরই পরিণাম। বদিউজ্জামান আস্তে বললেন, আমাদের এক-হাতে লড়াই করতে হবে হিন্দুদের সঙ্গে, অন্যহাতে আংরেজশাহির সঙ্গে।

বদিউজ্জামানের কথা বলতে ইচ্ছে করছিল না। অথচ বড়োগাজির কথার জবাব ভদ্রতাবশে দিতে হচ্ছে। একে-একে গ্রামের মান্যগণ্যেরা এসে জুটলে বড়োগাজির হাত থেকে একটু রেহাই পাওয়া গেল। কিন্তু এরাও তেমনি নাছোড়বান্দা। হুজুরের মুখে শাস্ত্রীয় তত্ত্ব শুনতে আগ্রহী। হুজুরকে খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। ছোটোগাজি এসে অবশেষে বাঁচিয়ে দিলেন। তাড়া দিয়ে বললেন, জোহরের নমাজের সময় মসজিদে ওসব কথা হবে। আপনারা এবার মেহেরবানি করে হুজুরকে একলা থাকতে দিন। উনি বড্ড পেরেসান। মহুলা কি এখানে?

লোকগুলো চলে গেলে বড়োগাজি ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে চাপা স্বরে বললেন, খানার কী ইন্তেজাম করলে?

মইজুর বললেন, খাসি জবাই হয়েছে।

বড়োগাজি মইজুর বাঁকা হাসলেন। বদিউজ্জামানের দিকে ঘুরে বললেন, আমাদের এই এক বদনসিব হুজুর। হরিণমারায় গোরু হালাল করা বারণ। হিন্দু জমিদারের মাটি। অনেক লড়াই করেছি।

বদিউজ্জামান আনমনে বললেন, মাটি আল্লাহ-তায়লার।

বড়োগাজি ক্ষুব্ধভাবে বললেন, আমি কয়েকবার চেষ্টা করেছি। কিন্তু ওই যে বললাম, মুসলমান নিজেই যদি নাফরমান-বেইমান হয়, তাহলে? হরিণমারার মুসলমান আমার হুকুমে খুন দিতে রাজি, কিন্তু এই কাজটি বাদে। ওরা বলে, চিরকাল এরকম চলছে। বাড়তি ঝামেলা করে কী হবে?

ছোটোগাজি মুখটিপে হেসে বললেন, তুমি দেখো না এবারে কী করি। হুজুরকে এতদিন বাদে যখন পেয়েছি, তখন আল্লাহ্ ভরসা। সামনে বকরিদের দিন হুজুর এখানেই এসে—

বদিউজ্জামান কথার ওপর বললেন, ইন্‌শা আল্লাহ্। আমি নিজের হাতে হালাল করব।

বড়োগাজি নেচে উঠলেন।···মৌলাহাটের তামাম মুসলমানকে জেয়াকত করব বকরিদের নামাজে।

ছোটোগাজি বললেন, হুজুরের হুকুমে নিজের জান কোরবান করব।···

বারি চৌধুরী হরিণমারার গাজিভ্রাতৃদ্বয়কে বলতেন ডনকুইক্সোট-সাংকোপাঞ্জা। সেবার বকরিদ পড়েছিল বর্ষাকালে। হরিণমারায় গোরু কোরবানি নিয়ে এলাকায় বড়ো রকমের হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা বাধার উপক্রম হয়েছিল। স্থানীয় পুলিশের তা থামানোর সাধ্য ছিল না। মুসলিম-অধ্যুষিত মহকুমা। এস ডি ও বাহাদুর ছিলেন এক অস্ট্রেলিয়ান সায়েব। সারকেল অফিসার মুসলিম। শেষ পর্যন্ত একটা ফায়সালা হয়ে যায়। গোরু কোরবানি চলবে, তবে সদর রাস্তা থেকে অনেকটা আড়ালে। মসজিদের পেছনে আগাছার জঙ্গলে ভরা পোড়ো জমিটাকে

এজন্য চিহ্নিত করে যান এস ডি ও চার্লস প্যাটারসন। খবর পেয়ে সদর শহর থেকে খানবাহাদুর গরিবুল্লা হক পর্যন্ত এসে হাজির হরিণমারায়। শুধু আসেন নি বারি চৌধুরী। কিন্তু মুসলমানদের এ একটা জয় তো বটেই এবং হুজুর পির বদিউজ্জান এর মহানায়ক। গুজব রটে যায়, কোরবানির দিন ইদগাহের প্রাঙ্গণ ছাপিয়ে বাঁজা ডাঙা অব্দি যে নামাজিদের দেখা গিয়েছিল, তাদের একাংশ ছিল মানুষবেশী জিন। বিলপারের গ্রাম ঝিঙেখালির ডানপিটে গোয়ালার দল উলুশরার মাঠে এসে জিনের পাল্লায় পড়ে পথ হারিয়ে ফেলেছিল। তারা অগত্যা ফিরে যায় নাকাল হয়ে। আবার এও শোনা যায়, গোয়ালারা তাদের বাঁজা আর বুড়ো গোরুমোষের বাড়তি খদ্দের জোটায় ভেতর-ভেতর খুশিও হয়েছিল। মৌলাহাটের হামছু কশাই নাকি এই গোপন খবরটা দেয়।···

তো সে অনেক পরের কথা। বদিউজ্জামান সেদিন মৌলাহাট রওনা হন বিকেলের নামাজ পড়ার পর। ছোটোগাজি তাঁর সঙ্গে এসেছিলেন। মৌলাহাটে পৌঁছুতে এশার নামাজের সময় হয়ে যায়। ফলে হুজুরকে প্রথমে মসজিদেই অবতরণ করতে হয়। নামাজ শেষে তিনি অবাক হয়ে লক্ষ করেন, মাথায় শাদা টুপি, পরনে কোর্তা-পাজামা, মুখে দাড়ি—একটি তরুণ নড়বড় করে ভিড় ঠেলে তাঁর দিকে এগিয়ে আসছে। তার মুখে অজস্র লালায় ভেজা হাসি ঝলমল করছে। নুরুজ্জামান পিতার পেছনের সারিতে ছিল। সে বলে উঠে, আব্বাসাব! মনিকে পহচান করতে পারলেন কি? আর প্রধান শিষ্যরা কোলাহল করে বলে ওঠেন, হুজুরের মোজেজা! মারহাবা! মারহাবা!

মোজেজাই বটে! বদিউজ্জামান বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। দ্রুত উঠে দাঁড়িয়ে এই প্রথম মেজো ছেলেকে আলিঙ্গন করলেন।

শোনা যায়, সেই প্রথম আলিঙ্গনেই মনি-রুজ্জামানের দেহ থেকে ততদিনে অতিকায় রুগ্ন কালো জিনটি পড়ি-কী-মরি করে ভেগে যায়। সে রাতে জ্যোৎস্না ছিল। মৌলাহাটের ওপর দিয়ে সব-কিছু প্রচণ্ড নাড়া দিতে-দিতে একটা আচানক তুফান বয়ে যায় এবং মসজিদের উত্তর-জানালা দিয়ে একটা কালো কিছু বেরিয়ে যেতে দেখেছিলেন মুসল্লিরা।

সাইদার কাছে খবর হয়েছিল, যে খবর হাওয়ার আগে ছোটে, হুজুর পিরসাহেব তাঁর মায়ের কবর জেয়ারত করে দুই ছেলের কাঁধে হাত রেখে রওনা হয়েছেন। কিন্তু ওই একটুখানি দূরত্ব অতিক্রম করতে কী সময় যে লেগে গেল! বারান্দায় রুকু ঘোমটা টেনে দাঁড়িয়ে ছিল। তার কাছ ঘেঁসে দেয়ালে সেঁটে আয়মনি, নুরির মা, আর নুরি। সাইদা যেই শুনতে পেলেন সদর দরজায় বরাবর শোনা সেই পবিত্র দোয়াদরুদ উচ্চারণ, অমনি গম্ভীর শান্ত কণ্ঠস্বরটি তাঁকে বিপন্ন করল বুঝি। শরমের মাথা খেয়ে সাইদা তাঁর ঘরে ঢুকে সশব্দে দরজা বন্ধ করে দিলেন। বারান্দায় চারটি মেয়ে ভ্যাবাচ্যাকা খেল। রুকু বন্ধ দরজার দিকে তাকিয়ে রইল। আর বদিউজ্জামান উঠোনে দাঁড়িয়ে সাইদার সংসার দেখছিলেন। চাঁদের আলোয় নুরুজ্জামান পিতাকে দেখাচ্ছিল সবকিছু। গোয়ালঘর, কুয়ো রান্নাঘর, টাট্টিখানা, বড় তিন-কামরা মাটির ঘরের খড়ের চাল, উঠোনপ্রান্তের গাছ-গাছালি। মনিরুজ্জামান তার ছড়িতে ভর করে দাঁড়িয়ে খালি দুলছিল আর দুলছিল। জ্যোৎস্নায় তার দাঁত চকচক করছিল। নুরুজ্জামান মায়ের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করাটা লক্ষ করে নি। করেছিলেন বদিউজ্জামান। অস্বস্তি বোধ করছিলেন।

কী-একটা আশঙ্কা করে এবং শরমে আয়মনি, নুরি, ও তার মা হালকা পায়ে খিড়কির দরজা খুলে বেরিয়ে গেল। বদিউজ্জামান বারান্দায় রুকুর উদ্দেশে যখন আস্তে বললেন, কে—তখন রুকু ঝটপট নেমে এসে শ্বশুরের পদচুম্বন করল। আর মনিরুজ্জামান গোঙানো কণ্ঠস্বরে আম্মাকে ডাকতে থাকল।···

[ক্রমশ

নাগরিক শামসুর রহমান

শামসুর রাহমানের শ্রেষ্ঠ কবিতা—দেজ পাবলিশিং, কলকাতা ৭০০০৭৩। পঁচিশ টাকা।

এক

বইটি উপলক্ষ। আসল উদ্দেশ্য, শামসুর রাহমানের শ্রেষ্ঠ কবিতা-নামক গ্রন্থটি সামনে রেখে কিছু প্রাসঙ্গিক কথাবার্তা বলা।

শামসুর রাহমানের জন্মসাল ১৯২৯। অর্থাৎ দেশ স্বাধীন এবং দেশ বিভাগ যখন হয়, তখন তাঁর বয়স আঠারো। ১৯৫২ সালে বাঙলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে যখন আন্দোলন হয় পূর্ব পাকিস্তানে, তখন তিনি তেইশ বছরের যুবক। এর আট বছর পরে তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়: 'প্রথম গান, দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে।' অর্থাৎ ১৯৬০। কবির বয়স একত্রিশ। পরবর্তী দশ বছর সময়ে তাঁর পাঁচখানি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। গড়ে দু বছরে একটি। মুক্তিযুদ্ধের প্রাক্‌কালে বেরুল 'নিজ বাসভূমে' বইটি—যার মধ্যে নানারকম কবিতার ভিড়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে উত্তপ্ত তীব্র ক্ষুব্ধ কিছু পঙক্তি। 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' (এখানে এসেছি কেন? এখানে কী-কাজ আমাদের?), 'বর্ণমালা, আমার দুঃখিনী বর্ণমালা' (নক্ষত্রপুঞ্জের মতো জলজলে পতাকা উড়িয়ে আছো আমার সত্তায়) এবং 'দুঃস্বপ্নের একদিন' (চাল পাচ্ছি, ডাল পাচ্ছি, তেল হুন লকড়ি পাচ্ছি) এই সময়কার রচনা। নিভৃতচারী আত্মমগ্ন মানুষটি স্বরচিত খোলশ থেকে বেরিয়ে আসছেন।

মুক্তিযুদ্ধের সময় শামসুর রাহমানের ভূমিকা এখন ইতিহাসে প্রতিষ্ঠিত। যুদ্ধক্ষেত্রের মাঝখানে, শত্রুশিবিরের প্রহরীর নাগালের মধ্যে দাঁড়িয়ে এই নির্ভীক মানুষটি ক্রমাগত স্বাধীনতার জয়গান করে গেছেন, প্রতিবাদ করেছেন অন্যায়ের, নৃশংসতার, ধ্বংসের। 'বন্দীশিবির থেকে' কাব্যগ্রন্থটি কবির জীবনের প্রধান ল্যানডমারক। যাঁরা সেই তাণ্ডবলীলা প্রত্যক্ষ করেন নি বা তার বীভৎস রূপ বিস্মৃত হয়েছেন এতদিনে, তাঁদের স্মরণ করাবার জন্যে ছোট্ট একটি কবিতা উদ্ধৃত করছি: 'কাক'।

গ্রাম্য পথে পদচিহ্ন নেই। গোঠে গরু নেই কোনো, রাখাল উধাও, রুক্ষ সরু আল খাঁ খাঁ, পথপার্শ্বে বৃক্ষেরা নির্বাক নগ্ন রৌদ্র চতুর্দিকে, স্পন্দমান কাক, শুধু কাক।

কবিমানুষ প্রত্যক্ষভাবে সমাজের কোনো কাজে লাগেন না। এই ধারণা ভুল প্রমাণিত হয়েছে বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের অভিজ্ঞতায়। রবীন্দ্রনাথ, নজরুল আর জীবনানন্দের একাধিক কবিতা এবং শামসুর রাহমানের অজস্র কবিতা পূর্ববাঙলার সাহসী ঘোদ্ধাদের অনুপ্রাণিত করেছিল। তাই যুদ্ধজয়ের পর, স্বভাবত, শামসুর রাহমান পেলেন স্বাধীন বাংলাদেশের জাতীয় কবির সম্মান। লক্ষ-লক্ষ মানুষের হৃদয়ে চিরকালীন আসন। এর পর তাঁকে নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে যাবে, তাতে আশ্চর্য হবার কী আছে!

'দুঃসময়ের মুখোমুখি' বইটি, মনে হয়, ওই সংকটকালেই রচনা। বা তার অব্যবহিত পরের। উত্তেজনার ঝাঁঝ এই কবিতাগুলিতেও বেশ আছে। কিন্তু তার পরের পনেরো বছর সময়ে কবির পনেরোটি কবিতার বই বেরিয়েছে দেখছি। গড়ে দু বছরে একটির বদলে প্রতি বছর একটি। প্রচুর কবিতা লিখেছেন আর লিখছেন শামসুর রাহমান। আজ তাঁর সাতান্ন বছর বয়সে সুস্থদেহ এক কাব্যসংসারে বাস করছেন এই ভাগ্যবান কবি। তিনি এখনো আগের মতন স্থিতিশীল। হয়তো ঈষৎ লজ্জিত। তাই এই পরিবারপরিকল্পনার যুগে বহু সন্তানের পিতার মতো বলেন, "আমার কাব্যগ্রন্থের সংখ্যা একটু বেশি।"

গ্রন্থসমালোচনা

দুই

দেখতে সুপুরুষ, ফরসা গায়ের রঙ, ধবধবে শাদা মাথার চুল—কেশ নয় কেশর বলা উচিত—পরিচ্ছন্ন পোশাক, সব সময় হাসিমুখ, শত প্ররোচনায় ক্ষিপ্ত হন না, প্রচুর মদ্যপান করে অটল থাকেন এবং অতি সজ্জন তাঁর সঙ্গে আলাপ করে আমাদের এইরকম ধারণা বদ্ধমূল হয়। স্বদেশে তাঁর আচরণ কীপ্রকার, আমরা জানি না। বুদ্ধদেব বসু-সম্পাদিত কবিতা পত্রিকার সময় থেকে আমরা তাঁর লেখার সঙ্গে পরিচিত। সেই ১৯৫৬ সালে ছাপা তাঁর-'যে-ছায়া আয়নায়' কবিতার ছটি লাইন —"অলোকসামান্য নয় লেখনী আমার, তুমি তাই / পারবে না কখনো এড়িয়ে যেতে কালের তিমির"—আজও মনে আছে। বিশেষ করে তার পরের ছটি শব্দ—"তাতে কী?" আজ অবশ্য আর একথা খাটে না। বা, 'কাল' বলতে কতখানি সময় বোঝাচ্ছে, তার ওপর নির্ভর করছে সবকিছু।

১৯৮৫ সালের শীতকালে কবিতা-উৎসব উপলক্ষে কলকাতায় এসেছিলেন। উদ্বোধন অনুষ্ঠানের শেষে একটি প্রদর্শনীর দিকে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, এমন সময় হঠাৎ চোখাচোখি হল।—"আরে শরৎ না?" কী করে চিনলেন? সেই তো প্রথম আলাপ। কোথাও ছবি-টবি দেখে থাকবেন, কিন্তু মুখ মনে রাখা তো সহজ কথা না। তারপর অনেক গল্প-সল্প হয়েছে। নিভৃতে কথা বলার জন্যে অনুষ্ঠানের সময়গণ্ডি থেকে তাঁকে উপড়ে তুলে এনেছি দু-এক ঘণ্টার ছুটিতে। নানা বিষয়ে কথা হয়েছে আমাদের। বোঝা গেছে, শামসুর রাহমান শুধু কবিতা লিখেই ক্ষান্ত নন, প্রচুর পড়াশোনা করেন। একাধিকবার বিদেশ ঘুরে এসেছেন। সত্যি, বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি বলতে তাঁর চেয়ে যোগ্যতর ব্যক্তি এখন আর কে আছেন? তাঁর মাধ্যমে বাঙলা ভাষা আর সাহিত্য বিশ্বের আসরে সম্মানলাভ করছে, পশ্চিমবঙ্গবাসী আমরা বৃহৎ ভারতের অবহেলিত নাগরিক তাতে গৌরববোধ করি।

একটি ছোট্ট ঘটনা মনে পড়ছে। এ বছর কবিতা-উৎসব উপলক্ষে আমরা সদলবলে কোচবিহার যাচ্ছি লাকশারি বাসে। বহরমপুরে মধ্যাহ্নভোজন সারা হল, তখন বিকেল। সামনে ফারাক্কা পর্যন্ত পথ খুব নিরাপদ নয় বলে একটি পুলিশের এসকর্ট গাড়ি চাওয়া হয়েছিল। পুলিশ অফিসার টুরিস্ট লজে এসে জানতে চাইলেন, বাসে কারা যাচ্ছেন। অনবধানবশত কেউ বলে ফেলেছে, এঁরা সব কবি, উৎসব করতে চলেছেন কোচবিহার।

ভদ্রলোক বিরক্ত হলেন উত্তর শুনে। "সে কী, এখানে খবর ছিল, বাংলাদেশের হাইকমিশনার যাচ্ছেন। তাঁর নিরাপত্তার জন্যে—"

—"তিনি তো আছেনই," বলে প্রত্যুৎপন্নমতি এক সহযাত্রী তাঁকে এগিয়ে নিয়ে গেলেন, আলাপ করিয়ে দিলেন, "ইনি শামসুর রাহমান, বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক রাষ্ট্রদূত।" শেষের শব্দদুটি 'ইতি গজ'-র মতো চাপা।

আলাপ করে পুলিশ অফিসার মুগ্ধ। বাস ছাড়ল সন্ধে নাগাদ—যেতে-যেতে আমরা দেখলাম, সামনের জিপগাড়িতে লাল আলো জ্বলছে নিবছে, জ্বলছে নিবছে।

মিথ্যে বলা হয় নি। শামসুর তো বিশ্বাস করেন, কবির পক্ষেই সম্ভব নিজস্ব অবদানে নব্য সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করা, সাংস্কৃতিক অগ্রগতির পক্ষে সহায়ক দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করা। লুই ম্যাকনীস বর্ণিত কবির সংজ্ঞা তিনি মানেন। ম্যাকনীস বলেছেন, কবি হবেন একজন সুস্থ সবল, বাক্‌পটু, সংবাদপাঠক, রসিক, অর্থনীতিসচেতন, নারীবৎসল, ব্যক্তিগত সম্পর্কে জড়িত, রাজনীতিপরায়ণ এবং কোমল-মন মানুষ।

তিন

বুদ্ধদেব বসু বলতেন, অনুরণন। একটা ভাবনা বহু শব্দের এবং বিচিত্র বিশেষণের সাহায্যে প্রকাশিত বা উচ্চারিত হচ্ছে যখন, তখন ছন্দোবদ্ধ সেই রচনায়, রচনাপাঠে অনুরণন জাগে। প্রথম জীবনের অকারণ দীর্ঘ কবিতাগুলিতে তো বটেই, বস্তুত পরবর্তী কালের অপেক্ষাকৃত ছোটো মাপের কবিতায়ও তিনি অনুরণন জাগাবার চেষ্টা করেছেন সচেতনভাবে। উপভোগ্য হয়েছে সেইসব কবিতা, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে স্মরণীয় হয় নি। বরং রবীন্দ্রনাথের পরে তিরিশের যুগের যাঁরা স্বচ্ছ বাকবাহুল্য এড়িয়ে অনভ্যস্ত অথচ তীব্র ভাষা আর ছবির অনুসন্ধান করেছেন, হৃদয়াবেগ শাসন করে এনেছেন গাঢ়তা, কিংবা জীবনানন্দ যেমন তাঁর কবিতায় কুয়াশা-ঢাকা এক ধূসর জগতে পৌঁছে দিয়ে আমাদের বুদ্ধিদীপ্ত সংশয়ী মনকে করে দিয়েছেন নিষ্প্রভ—তাঁরাই সফল হয়েছেন বেশি। তাঁদের রচনায় হয়তো পরিচিত বস্তু রহস্যময় ঠেকেছে চোখে কিন্তু সেই রহস্যের আড়ালে কোনো-না-কোনো গভীর সত্যের ইঙ্গিত আমরা পেয়েছি যা আমাদের বিস্মিত আর মুগ্ধ করেছে। সুধীন্দ্রনাথের সঙ্গী আমরা হই নি, কারণ তাঁর লেখায় অন্তর্মুখী আর কৌশলের ভারসাম্য ছিল না তেমন, কিন্তু অনুসরণ করতে চেয়েছি জীবনানন্দ, বিষ্ণু দে এবং সমর সেনকে। অথচ ভাষা আর ছবির ব্যবহারে একালের শামসুর রাহমানকে বিশেষ যত্নশীল হতে দেখি না। অনর্গল কথা, পঙক্তির পর পঙক্তি বিশেষণে ভারী এবং অযথা দীর্ঘায়িত তাঁর কবিতা মনের মধ্যে স্থায়ী দাগ রাখছে না ভেবে উদ্বিগ্ন হতে হয়।

'কবিতার সঙ্গে গেরস্থালি'-নামক সাম্প্রতিক কাব্যগ্রন্থের নাম-কবিতায় কবি স্পষ্ট বলেছেন:

তিরিশের কবিসংঘ দিলেন প্রবল

ডাক, পোড়ো জমি থেকে
হাতছানি দিলেন এলিয়ট, কান
পাতলাম
এলুয়ার এবং আরাগঁর যুগল-
বন্দীতে আর নিমেষে
তারুণ্যের তেজে হঠকারী অব-
হেলায়
সঞ্চয়িতাকে ধুলোয় মলিন হতে
দিয়ে
স্বভাবত স্বতন্ত্র রবীন্দ্রনাথ থেকে
দূরে সরে গেলাম
ভিন্ন স্বাতন্ত্র্যের আকুল সন্ধানে।
বুঝি তাই
তখন আমাকে লিখতে হলো—
'মধ্যপথে কেড়েছেন মন
রবীন্দ্র ঠাকুর নন, সম্মিলিত তিরি-
শের কবি।'

বস্তুত, এই তিরিশের কবিদের রচনসূত্রে আধুনিকতা এসেছে বাঙলা কবিতায়। ইউরোপীয় সাহিত্যের জটিল দরোজাগুলি খুলে গিয়েছে আমাদের সামনে। আমরা শিখেছি, কবিতা হৃদয়াবেগ জাগাবে, নিজে উপচে পড়বে না। কবিতা সেই প্রেরণাজাত অঙ্ক যা দিয়ে সমীকরণ সম্ভব—মানুষের ভাবাবেগের সমীকরণ। আমাদের সাবধান করে দেওয়া হয়েছে, বর্ণনা বা বিবরণ নয়, শব্দই হল কবিতার স্নায়ু। ঐতিহ্য আর সমসাময়িকতা, গভীর মনের আনন্দ-বেদনা, অনুভব আর অভিজ্ঞতা, মেধামার্জিত সতর্ক শব্দের প্রয়োগে উঠে আসবে কবিতায় গাঢ় হয়ে, বিশ্বাসযোগ্য এবং স্মরণীয় হয়ে। গদ্যের পক্ষে যেখানে পৌঁছনো সম্ভব নয়, সেটি হল কবিতার ক্ষেত্র।

শামসুর রাহমান যেন সেই পথ এড়িয়ে গেছেন। বন্দীশিবির পর্যায়ের উত্তেজনা ক্রমশ স্তিমিত হয়ে যাবে, জানা কথা, কিন্তু তার পরবর্তী কালের লেখায় কবি ক্রমশ হয়ে উঠবেন একজন সমাজসচেতন মানুষ, সুরসিক নাগরিক মাত্র, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় অভিভূত, গণ্যমান্য একজন সাংবাদিক—এবং তাতে গর্ববোধ করবেন, এ যেন স্বীকার করে নেওয়া যায় না। মুক্তিযুদ্ধের পর বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে ঠিক, কিন্তু তার টালমাটাল অবস্থার তো উন্নতি হয় নি। বাঙালি সমাজের একাংশ ধনী হয়েছে, পেয়েছে আভিজাত্যের পোশাক কিন্তু অপর বৃহৎ অংশ যে আজও উদ্ধারের অপেক্ষায়, কবি কি সেদিকে চেয়ে দেখবেন না? দেখলেও 'আমি ভালোবাসাকেই ভোট দিয়ে ঘরে কিংবা পার্কে যাবো শিস বাজাতে বাজাতে' এইরকম কথকতার চাতুর্যে নিজেকে এবং পাঠককে ভোলাবেন? নাকি, এই তাঁর নির্লিপ্ত উদাসীনতার সরল চেহারা! ওপর থেকে দেখা জীবন!

বিশেষণের কথা তুলেছিলাম। দেখা যাচ্ছে, শামসুর রাহমান বরাবরই উদারভাবে বিশেষণ আর চটজলদি উপমা ব্যবহার করতে ভালোবাসেন। এর ফলে কবিতায় বৈচিত্র্য আসে, কিন্তু পারম্পর্য বিঘ্নিত হলে কবিতাকে কিছুটা কেন্দ্রচ্যুত করে। ক্যাটালগ-সমেত চমৎকার একটি পাঠ্যবস্তু হয়তো পাওয়া গেল, কিন্তু পুরো ছবিটা ফুটল না। যেমন ছবি জীবনানন্দ তাঁর 'বনলতা সেন' ও অন্য অনেক কবিতায় ফুটিয়েছেন। দেখা যাক 'তোর কাছ থেকে দূরে' কবিতার এই অংশটি:

যখন এখানে ছিলি, বুকের নিকটে
ছিলি, তোর হস্তদ্বয়
আমার স্বপ্নের ঝাড়লণ্ঠন বেবাক
অতিশয়
হিংস্রতায় বারংবার দিয়েছে
দুলিয়ে। চুরমার
এ-ঘরে নিত্য যা কিছু ভঙ্গুর আর
প্রগাঢ় সুর্মার
মতো অন্ধকার চোখে নেমে
এসেছে আমার ভরদুপুরেই।
এখন এখানে নেই, তুই নেই,
আমার বুকের মধ্যে সবুজ পুকুর।

স্বপ্নের ঝাড়লণ্ঠন ছিল, অতিশয় হিংস্রতায় কেউ বারবার দুলিয়েছে, জিনিসপত্র ভেঙেছে তার ফলে, আলো নিবেছে, কিন্তু 'প্রগাঢ় সুর্মার মতো' অন্ধকার কেন? ও কি চুরমার-এর সঙ্গে মিল দেবার জন্যে এল? তারপরেই দেখছি, সেই ব্যক্তি এখন অনুপস্থিত, সুতরাং বুকের মধ্যে সবুজ পুকুর। পুকুরকে সবুজ কেন হতে হল? কেন পুকুর? শূন্যতা বোঝাতে, নিস্তরঙ্গ বোঝাতে? এই রকম চপল শব্দবন্ধ যত্রতত্র সচেতনভাবে ব্যবহৃত হয়েছে দেখছি তাঁর কবিতায়:—কামোদ চুম্বন, গ্রন্থিল জগত, দুশ্চিন্তার ঢাক, বিরক্তির মাছি। রোদ্দুরের অশ্লেষ স্কোয়াশ অবধি। তা ছাড়া, মতবাদের সাঁড়াশি, বিচ্ছিন্নতাবোধের পাতাল তো আছেই। আমরা বলতে চাই, শব্দকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে দিন, কবি কেন তার মাথায় আবার ছাতা ধরছেন?

এসব সত্ত্বেও শামসুর রাহমানের কবিতার সবচেয়ে বড়ো গুণ হল তার বুদ্ধিদীপ্ত ভাষা। আর সেই ভাষার পেছনে একটি স্থায়ী অকাতর মন। দেশের পরিধি ছাড়িয়ে বিশ্বের মানুষের কাছে পৌঁছতে উৎসুক তিনি মনে হয় আজকাল, তবু বলব, তাঁর ব্যক্তিগত-প্রসঙ্গ-নির্ভর কবিতাগুলিই সবচেয়ে হৃদয়গ্রাহী। কবর-খোঁড়ার গান, একজন লোক, বাড়ি, কখনো আমার মাকে একটা চাদর, বংশধর—এগুলি কখনও ম্লান হবে না। এবং এগুলি সব বন্দীশিবিরের আগের পর্যায়ের লেখা। সাম্প্রতিক কবিতায় কনিষ্ঠ কন্যার হাত ধরে—এই মেজাজ যেন আবার ফিরে আসছে।

লুই ম্যাকনিসকে মাইনর ইংরেজ কবি বলা হয়। তাঁর বর্ণিত কবি একজন সপ্রতিভ নাগরিক মানুষ। কিন্তু তা ছাড়া তিনি ধ্যানী কি না, ধার্মিক কিনা প্রকৃতি ও জীবনজগতের কাণ্ডকারখানা দেখে বিস্মিত আর কাতর কিনা আমরা জানি না। যদি জানতাম, তাই, তবে বলতে পারতাম, ওই কবি-মানুষ আমাদের কাছের মানুষ।

শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়

কবিতা, প্রভাবিত কবিতা ও না-কবিতা

বিদায় কোন্নগর—কবিরুল ইসলাম, ছন্দ, কলকাতা—৭০০০১৭। ১৯৮২। দশ টাকা।

সন্ধের লোকাল ট্রেন—শান্ত রায়, কৃশাণু প্রকাশন, কলকাতা-৭০০০৬৪। ১৯৮৫। দশ টাকা।

যাওয়া নেই, ফেরা নেই—নীলাঞ্জন মুখোপাধ্যায়, জিজ্ঞাসা, কলকাতা-৯। ১৯৮৪। দশ টাকা।

রূপের তাণ্ডবে রূপ—হেমন্ত মিশ্র। ডি, এম, লাইব্রেরী, কলকাতা-৬। ১৯৮৪। বারো টাকা।

'যেখানে তোর দুর্বলতা সেইখানে তোর জোর'—'বিদায় কোন্নগর'-এর নামকবিতাটির শেষ পঙক্তি এটি। সরল উচ্চারণে কবিরুল বিশ্বাসী এবং এখানেই তিনি প্রবল শক্তিশালী। বিরহবেদনা কবিকে প্রাণিত করে কবিতা লেখায়। বিষণ্ণতায় আক্রান্ত কবি 'হৃদয় নামক কারাগারে' স্পর্শাতুর জেগে আছেন। যখন তিনি লেখেন 'হাত আছে-হাতছানি নেই' তখন সে ব্যথা পাঠকেরও মন ছুঁয়ে যায়। কবির নিজস্ব মেধাবী যন্ত্রণা তখন সার্বজনীন। কবিরুল জানেন কেমন করে আন্তরিকতায় ভালোবাসায় অন্যকে বিহ্বল করে দিতে হয়।

এই কাব্যগ্রন্থের অনেকগুলি কবিতায় 'ঘর ও বাহির' ব্যবহৃত। মূলত তাঁর মনে হয় ঘর ও বাহির একই। বাহির কখনো ঘর হয়ে যায়, কখনো বা ঘর বাহির। 'আমার ঘরই প্রকৃত বিদেশ থেকে গেল' কিংবা 'আমার ভেতরের ঘর—তার সব খবরই / যেমন ছিলো, অন্ধকারে থেকে গেলো।' ভেতর-বাইরের নিত্যদ্বন্দ্বে কবি ক্ষয় হচ্ছেন কিংবা নতুন জন্মের আস্বাদ পাচ্ছেন 'ভিতর বাহিরময় সংক্রান্তির হাওয়া' যদিও কবিকে তাড়িয়ে ফিরছে।

রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ আর বুদ্ধদেব বসু—এই তিনজন কবির উল্লেখ পেয়েছি তিনটি কবিতায়। বলা বাহুল্য, এঁদের উল্লেখ প্রয়োজনেই। কিন্তু স্বাভাবিকভাবে সচেতন পাঠক ভাবতে পারেন এঁরাই তবে কবির আপনপ্রিয়। এই সিদ্ধান্ত স্বাভাবিক হলেও ভুল, কারণ কবিতায় গড়নে-গঠনে, পটভূমিনির্মাণে, বাক্যবন্ধ-ব্যবহারে কবিরুল পঞ্চাশ দশকের কবিদের শ্বাসপ্রশ্বাসে অধিকতর আলোড়িত, যদিও তিনি ষাটদশকের অন্যতম গৃহীত কবি। এই দশকবিভাজন প্রবন্ধকারের কাছে প্রয়োজনীয়, কিন্তু কবির তাতে কী যায় আসে। কবিরুল সব সময়ের কবিতা লিখতে চেয়েছেন—কোনো একটি দশকের জন্য নয়। কবিতা যে শুধু কয়েক দণ্ডের 'কারিগরী কুশলতা' বা 'চিত্র ও সঙ্গীতময় শব্দের' মহোৎসব কিংবা 'ছন্দের সম্মোহন ও অনৃতভাষণ' নয়—কবি উপলব্ধি করতে পেরেছেন। এইসব মিলিয়ে বা ছাড়িয়ে অন্য এক ব্যঞ্জনা কবিরুলের মনে হতে থাকে। তাৎক্ষণিক তৃপ্তির চেয়ে চিরন্তনের আনন্দসন্ধানী কবির ভিতরে বাহিরে নিয়ত ভূমিকম্প।

শান্ত রায় তাঁর কাব্যগ্রন্থে শঙ্খ ঘোষের একটি উক্তি উদ্ধার করেছেন—'কোনো দিক থেকেই, ভেঙে পড়বার সংগত কোনো সমর্থন নেই।' সন্ধের লোকাল ট্রেন'-এর অনুষঙ্গে স্বাভাবিকভাবে কিন্তু চলে আসে কিছু ভেঙেপড়া ক্লান্ত মানুষের মুখ 'কিংবা ঊষর-ভূমির দীর্ঘশ্বাস'। 'ঘামতেলতেলে মুখে ঈপ্সিত ট্রেনের দিকে ছুটে যায় / ক্লান্ত মানুষেরা / এই কি গোধূলি? মনে হয়, শান্ত অশান্ত দিনের শেষে ঘরে ফেরার কথা বলতে চান তাই 'ঈপ্সিত' বিশেষণটি তাৎপর্যময় হয়ে ওঠে। তাঁর বলার ধরনটি চমৎকার—ছলচাতুরীহীন কবি মৃদুস্বরে কথা বলে যান—পরিশীলিত মুগ্ধ বর্ণমালা পাঠকের

মীনাক্ষিকে লক্ষ্যভেদ করে।

কিছু প্রতীক, কিছু উপমা, কিছু রূপক শান্তর কবিতানারীর শরীরে কারুকার্যময় সোনারুপোর গয়না। কয়েকটি উদ্ধার করতে ইচ্ছে হয় :

'তোমার বুকের ঠিক সন্ধিস্থলের
মতো গভীর সুবর্ণরেখা'

'বাইরে এক প্রাচীন চিত্রী চাপ-
চাপ কালচে পাথরের মাথায়
এইমাত্র ঢেলে দিলেন
গলানো রুপো।'

'আমার ছেলেবেলার বন্ধু ভোর'

'তোমার জন্যে আকাশে রাখা
শ্বেতপাথরের বাটিতে পায়েস'

কিন্তু একই সঙ্গে ছেলেমানুষি কথাবার্তা, অত্যধিক আবেগময়তা, শরীরের টানাপোড়েনের রিমঝিম অন্ধকার, একেবারে গদ্যময় প্রসঙ্গহীন বিবৃতি শান্তর কবিতাকে খাটো করে। পাঠকের আশার সলতে উশকে দিলেই হয় না—দীর্ঘস্থায়ী আলোর জন্য আরো রক্তকান্নাঘাম ঢেলে দিতে হয় তেলের মতো প্রদীপের বুকে।

কাব্যগ্রন্থটির প্রচ্ছদ পূর্ণেন্দু পত্রীর। চমৎকার বললে কম বলা হয়। বারে বারে ফিরে দেখে মুগ্ধ হবার মতো এই শিল্পকর্ম।

সমকালীন কোনো কবির কবিতায় রবীন্দ্রনাথের এমন উজ্জ্বল উপস্থিতি দেখা যায় না। নীলাঞ্জন মুখোপাধ্যায় তাঁর 'যাওয়া নেই, ফেরা নেই' উৎসর্গও করেছেন এইভাবে : শতবর্ষের দূরত্বে আমার সমবয়সী বন্ধু। অন্ধকারের ঘুমজাগানিয়া রাজা / আমার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর / তোমাকে, প্রণামে।' 'রাজা' নাটকের প্রথম দৃশ্যের সুদর্শনার কথাও উদ্ধার করেছেন। রবীন্দ্রনাথের শব্দবন্ধ নির্বিচারে ব্যবহার করেছেন, যেমন, 'স্বপ্নে পাওয়া বাদল হাওয়া কত নিশীথ অন্ধকারে' কিংবা 'আমাকে যে জাগতে হবে কী জানি সে আসবে কবে' অথবা 'দিনেকের দেখা, তিলেকের সুখ ক্ষণেকের তরে শুধু হাসিমুখ।' তবু তিনি এসব ছাড়িয়ে অন্যত্র যেতে চেয়েছেন এ গ্রন্থে সংকলিত ৭২টি কবিতায়। কিন্তু তাঁর এই যাওয়া এবং যাওয়ার প্রার্থনা মাঝে-মাঝেই মাত্র সাবলীল এবং সার্বিকভাবে কাব্যিক। অনেক কবিতাতেই অন্য কবির পদশব্দ বা উষ্ণ নিঃশ্বাস, প্রভাব কিংবা মোহ।

এই সময়ের অজস্র কবির মতো নীলাঞ্জনও শব্দসচেতন। এখানেই তাঁর সবলতম অধিকার। ছন্দব্যবহারে নিয়ত যত্নময়—প্রায় কোথাও একটিও ধ্বনি পড়ে যায় নি। প্রশংসনীয় দক্ষতায় অনুভবের রূপময় প্রকাশ ঘটিয়েছেন। তবে 'রুপোলী রোদ,' 'সপ্তরঙ আলো', 'নিবিড় নীল,' 'সোনার ধানের দেশ,' 'বনগন্ধ', 'বাউল বাতাস,' 'সিঁদুরে মেঘ,' 'কমলা বিকেল,' স্মৃতি-কীট', 'পাগলপারা' ইত্যাদি শব্দবন্ধ আর কি কবিতা-পড়ুয়াদের এখন ভাবায়। কিন্তু কোথাও কোথাও প্রাচীন শব্দগন্ধও এত যে ব্যঞ্জনাময় সুরভি ছড়ায় তার মূল্যই বা কম কিসে! যেমন, 'চার দেওয়ালের দীর্ঘ ছায়ায় বালকবেলার দীপ্র স্থিতি / অমরাবতী / তোর দেহে শ্লোক, তোর চোখে পথ, স্পর্শকাতর মধুমালতী / সেও কি স্মৃতি'। সম্ভবত এটি নীলাঞ্জনের প্রথম কাব্যগ্রন্থ। তাঁর আগামী কবিতায় নিশ্চয় ঋতুবদল ঘটবে—সেই সংকলনের দিকে প্রত্যাশায়, অপেক্ষায় থাকতে ইচ্ছে করবে।

সুপরিচিত পরিণত চিত্রশিল্পী হেমন্ত মিশ্র কবিতা লিখতে শুরু করলেন কেন এ প্রশ্ন প্রথমেই জেগে ওঠে। শিল্পীকে কি কবি হতে হবেই? চিত্রশিল্পী অক্ষরশিল্পী নাও হতে পারেন। নিজস্ব আপেক্ষিক দক্ষতার সুযোগ-সুবিধাগুলি বিবেচনা করে একটি শিল্প-মাধ্যমই খুঁজে নেওয়া সম্ভবত সংগত। কাব্যগ্রন্থটিতে শিল্পীর অলঙ্কৃত ছবিগুলি নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়—কিন্তু সঙ্গের কবিতাগুলি নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। শ্রদ্ধেয় প্রেমেন্দ্র মিত্র-র ভূমিকা সত্ত্বেও একথা বলতে বাধ্য। তাঁর কাব্যচর্চার একটি নমুনা পেশ করা যাক—

'আমার হিয়া
সবুজে ভরা
কাটিলে পিষিলে
ঝরে না সোনা
কাঁচা সোনা হলুদীয়া
ঝরে চোখের জল
সিঁদুরে রাঙা'

আধুনিক বাঙলা কবিতার প্রেক্ষিতে এসব উচ্চারণ এখন মেকি পয়সার মতো অচল।

মঞ্জুষ দাশগুপ্ত

লোরকার ট্র্যাজেডি-ত্রয়ী

জীবনকুমার মুখোপাধ্যায়

১

১৮৯৮ সালের ৫ই জুন গারসিয়া লোরকার জন্ম। মাত্র আটত্রিশ বছর তিনি বেঁচেছিলেন, বা বাঁচতে পেরেছিলেন। ফ্রাঙ্কোর অনুগামী স্পেনের ফ্যাসিসট বাহিনী ১৯৩৬-এর জুলাই মাসে তাঁকে হত্যা করে। যথোচিত মর্যাদার সঙ্গে তাঁর সমাধির ব্যবস্থাও করে নি তারা। শত্রুরা লোরকার পরমায়ুকে সংক্ষিপ্ত এবং মানমর্যাদাকে ভূ-লুণ্ঠিত করতে চাইলেও স্প্যানিশভাষী মানুষের মধ্যে লোরকার জনপ্রিয়তাই সর্বাধিক। এবং আধুনিক স্পেনের কবি সাহিত্যিকদের মধ্যে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও তাঁকেই সবাই সবচেয়ে বেশি চেনে এবং জানে।

ব্যক্তিগতজীবনে আইনের ছাত্র লোরকা গোড়ার দিকে ছিলেন একজন লোকসংস্কৃতিপরায়ণ বুদ্ধিজীবী। সংগীত এবং চিত্রকলার পৃষ্ঠপোষক। কিন্তু কালক্রমে দেখা গেল, এই ব্যক্তিই অনেক আগুনের ফুলকির উৎস যার পরিপ্রেক্ষিতে রয়েছে লোকায়ত জীবনচর্যার এবং 'কুলতো' ঐতিহ্যের সঙ্গে তাঁর নিবিড় একাত্মতা। ফলে স্বজাতির একাংশের হাতে নিগৃহীত হলেও, এ যুগের আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তাঁকেই স্পেনীয় সংস্কৃতির সুযোগ্য উত্তরাধিকারী হিসেবে বিবেচনা করা হয়,—স্পেনীয় সংস্কৃতির নানামুখী ধারা-উপধারার সবগুলিই যেন তাঁর সংগ্রহণশীল চিত্তের পাশ দিয়ে বয়ে গেছে।

য়ুরোপের অন্যান্য দেশের সঙ্গে তুলনায় এইখানে স্পেনের একটা বিশেষত্ব চোখে পড়ে। য়ুরোপের সর্বত্র, রেনেসাঁসের ফলে সাহিত্যসংস্কৃতি তথা জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে যে পালাবদল সংঘটিত হয়েছিল, স্পেনে ঠিক একই অর্থে তা ঘটে নি। এদেশে রেনেসাঁস মধ্যযুগের উপর যবনিকা টেনে দেয় নি, বরং মধ্যযুগের অনেক কিছুকে প্রচ্ছন্নভাবে আধুনিকদের কাছেও নিয়ে এসেছে। মৌখিক গীতিকাব্যের ধারা মধ্যযুগের স্পেনে ছিল অত্যন্ত প্রবল। লোপ, ডি ডেগার দান এক্ষেত্রে অপরিসীম। এই প্রভাব আধুনিক কালের যেসব কবির মধ্যেও অব্যাহত, লোরকা তাঁদের অন্যতম।

লোরকার মতো আধুনিক এবং তরুণ কবিগোষ্ঠীর উপর আধুনিক কবি হিসেবে জিমেনের প্রভাবপ্রতিপত্তি ছিল যথেষ্ট। জিমেনে আবার ক্রোচে এবং ব্রেমঁর নন্দনতত্ত্ব মেনে চলতেন। কিন্তু লোরকার অফুরন্ত মানসিক চাহিদার তৃপ্তি সেখানে যথেষ্ট ছিল না। তাই উত্তুরে হাওয়ায় তিনিও মনের পাল তুলে দিলেন। উত্তরের দেশ ফ্রানসে তখন, অর্থাৎ এই শতাব্দীর বিশের দশকে, কাব্যসাহিত্যের ক্ষেত্রে সমকালীন সর্বপ্রকার মতবাদ নিয়ে তুমুল পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। লোরকার কবিমন তার সঙ্গে সাযুজ্য রচনা করল।

কিন্তু নাট্যকার হিসেবে লোরকা হয়তো সমধিক প্রসিদ্ধ। এ শতাব্দীর সফলতম ট্র্যাজেডিগুলির কয়েকখানির মধ্যে লোরকার অন্তত একখানি ট্র্যাজেডি নিতেই হবে। এই ট্র্যাজেডি রচনার দিকে তাঁর আগ্রহ প্রথম থেকেই বর্তমান। একটা বিষাদময়তার ভাব তাঁর মনকে গোপনে আচ্ছন্ন করেছে চিরকালই। প্রারম্ভিক পর্বে তিনি যে পুতুলনাট্যদ্বয় রচনা করেছিলেন, সেগুলি প্রহসনধর্মী হলেও তাদের আকাশ বিষাদের ঘন মেঘে আচ্ছন্ন।

বিশ্বসাহিত্য

তাঁর নাট্যনিষ্ঠা ছিল অবিসংবাদিত। তাই সরকারি আনুকূল্যে প্রতিষ্ঠিত 'লা বারাকা' নামে ছাত্র-নাট্যসংস্থার তিনি হয়েছিলেন সর্বময় অধিকর্তা। সেই সূত্রে তিনি লোপ ডি ডেগা, ক্যালডিরন প্রভৃতি প্রাচীন তথা প্রধান নাট্যকারদের নাটকসমূহ মঞ্চস্থ করেন এবং নাটক রচনা এবং প্রযোজনার বিষয়ে অনেক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন। এরই প্রত্যক্ষ ফল তাঁর ট্র্যাজেডিত্রয়ী।

২

লোরকার ট্র্যাজেডি-ত্রয়ীর মধ্যে প্রথমখানির নাম 'রক্তাক্ত পরিণয়' (ব্লাড ওয়েডিং)। তিন-অঙ্ক-সাত-দৃশ্য-সংবলিত এই নাটকটির ট্র্যাজিক ঘটনাবলী সম্পূর্ণ কাল্পনিক নয়। সংবাদপত্রের ঘটনা অবলম্বনে এটি রচিত। সংবাদপত্র থেকে সদ্যঃপ্রাপ্ত ঘটনা অবলম্বনে সাহিত্যরচনা পৃথিবীর সব দেশেই প্রচলিত, স্পেনদেশে তো বটেই।

নাটকটির নাট্যবস্তুর মধ্যে দেখা যায়, একটি শুভবিবাহ অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। পাত্রটি সৎ, সম্ভ্রান্ত, ধনী এবং

ভত্র। পাত্রীটিও সবদিক থেকে উপযুক্ত। পাত্রটির মনে কোনো দ্বন্দ্ব নেই, কিন্তু পাত্রীটির আছে। সে ভুলতে চায় তার পূর্বপ্রণয়ী লিয়োনার্দোকে, কিন্তু লিয়োনার্দোর প্রতি মানসিকভাবে সে আকৃষ্ট হয় চুম্বকের প্রতি লৌহের মতো। তারই ফলে বিবাহের রাত্রিতে লিয়োনার্দো তাকে নিয়ে পালিয়ে যেতে সমর্থ হয়। পরের ঘটনা, পাত্রপক্ষ আর পাত্রীপক্ষের একত্রে পাত্রীর অন্বেষণ। কিন্তু তার আগেই লিয়োনার্দো পূর্বপ্রণয়িনীকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে যে তার মৃত্যু না ঘটা পর্যন্ত কেউ তাদের বিচ্ছিন্ন করতে পারবে না। শেষে দেখি লিয়োনার্দো এবং পাত্র দুজনেই সংঘর্ষে নিহত। শূন্য হয়ে গেল অনেকগুলি জীবন—লিয়োনার্দোর বিবাহিতা পত্নী, অসমাপ্ত বিবাহের পাত্রী, অসমাপ্ত বিবাহের আশাপথ-চাওয়া জননী—সকলেই ট্র্যাজেডির বলয়ের মধ্যে নিপতিত হলেন।

স্পেনীয় ট্র্যাজেডির প্রাচীন সুর এই নাটকে যেন শোনা যায়। নাটকটির শেষে করুণার ভাব যথেষ্ট, বিশেষত শেষ দৃশ্যে—পাত্রীটি যখন কালো বস্ত্রে আচ্ছাদিত অবস্থায় তার ব্যর্থ সম্পর্কের শ্বশুরের কাছে মনের কথা প্রকাশ করছে এবং নিজের আবেগের কাছে নিজের অসহায়তার অনুতাপে নিজেকে নির্যাতিত করতে চাইছে, মৃত্যু ভিক্ষা করছে।

বিংশ শতাব্দীর উত্তরাধিকারের পরিপ্রেক্ষিতে উচ্চকোটির ভাবভাবনা নাটকটিতে নেই। নিয়তির পীড়নপ্রসঙ্গ এক্ষেত্রে অবশ্য বিবেচ্য হতে পারে। অমোঘ নিয়তি নিয়ে লোরকা কিছু ভাবনাচিন্তা করেছিলেন বলে মনে হয়। মানুষের জীবনে স্বপ্ন আর বাস্তবের মধ্যে যখন সংঘাত বাধে, তখন যে শক্তি আত্মপ্রকাশ করে জীবনের অধীশ্বর হিসেবে, তাকে নিয়তি ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। মানুষ এর ক্রীড়নকমাত্র। লোরকার এরকম একটা বিশ্বাস ছিল বলেই মনে হয়। বৈপ্লবিক জীবনচেতনা এবং ফরাসি আধুনিকতার দ্বারা প্রভাবিত হওয়া সত্ত্বেও সভ্যতার নিয়মশৃঙ্খলা এবং আদিমতার আবেগের মধ্যকার দ্বন্দ্বে মানুষের জীবনের সর্বনাশকেই যেন লোরকা নির্দেশিত করেছেন। নিয়তিকে কেন্দ্র করে এই ট্র্যাজেডিচেতনা একটু অনাধুনিক হলেও এর সর্বকালীন গ্রাহ্যতাকেও অস্বীকার করা যায় না। এখানেই এর শিল্পগত মূল্য।

এই নাটকে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য বিবাহের পাত্রীটি। একটা প্রচণ্ডতার প্রতি তার যে দুর্নিবার মোহ, সেটাই তার জীবনে অমঙ্গলের প্রবেশপথ রচনা করে দিয়েছে। কিন্তু অমঙ্গলকেই মঙ্গলরূপে বরণ করতে সে প্রস্তুত। চিরকালই ট্র্যাজিক চরিত্রের মধ্যে এই প্রস্তুতি দেখা গেছে। তাই ট্র্যাজিক চরিত্র হিসেবে সে অবিসংবাদিত। নাটকের শেষ দৃশ্যে তার উক্তিটি অবিস্মরণীয় : আপনার পুত্র (যার সঙ্গে বিবাহ অনুষ্ঠিত হতে চলেছিল) এককোঁটা জলমাত্র, যার কাছ থেকে আমি সন্তানসন্ততি, ভূ-সম্পত্তি, স্বাস্থ্য প্রভৃতি আশা করতে পারতাম, কিন্তু অন্যজন (লিয়ানার্দো) হচ্ছে কাঁটাঝোপে ভরা অন্ধকারের নদী—যা প্রখরস্রোতের কলকল্লোল আর চাপা সংগীতকে আমার কাছে টেনে আনে। আপনার ঠাণ্ডা জলের ছোট্ট ছেলেটির সঙ্গেই আমি পথচলা শুরু করেছিলাম, কিন্তু অন্যজন উলটো দিক থেকে হানল এক বিরাট পাখির ঝাঁক, যারা আমার পথের মধ্যে এসে পড়ে আমার ক্ষতচিহ্নগুলির উপর সাদা তুষার ছড়িয়ে গেল—এ ক্ষতচিহ্ন এক অসহায় বিধ্বস্ত নারীর—একটি মেয়ের, আগুনের আলিঙ্গন যে লাভ করেছে।

এখানে পাত্রীটির যে ব্যক্তিত্ব এবং জীবনতৃষ্ণা ব্যক্ত হয়েছে, তা সম্পূর্ণই যুগোপযোগী। জীবনে রোমানটিকতার হাতছানিকে অস্বীকার করে প্রথার কাছে মাথা নত করতে এ যুগে নারীপুরুষনির্বিশেষে কেউই চায় না। কিন্তু এইসব ক্ষেত্রে পুরুষের চেয়ে নারীর সমস্যাই বেশি, যেহেতু তার ভূমিকা প্রার্থীর। এবং অপূর্ণ প্রার্থনার বিড়ম্বনার যন্ত্রণায় সে আহতবৃশ্চিকসম অবিরত আপন মস্তকে হানে দীপ্ত বজ্রশূল। চরিত্রের এই একমুখিতাকে ট্র্যাজেডিতত্ত্বের শাস্ত্রানুযায়ী একটা চারিত্রিক ভ্রান্তি হিসেবেই ধরে নিতে হবে, এবং সঙ্গে-সঙ্গে একথা স্বীকার করতে হবে যে, এটা অবাস্তবতা নয়। এই সংসারে বাঁচতে গেলে বাস্তবকে অস্বীকার করলে চলে না, আবার বাস্তবকে স্বীকার করতে গেলে তার মারণযজ্ঞের সমিধ হবার জন্যও প্রস্তুত থাকতে হয়। এটাই ট্র্যাজিডি। জীবনসত্যের এই ট্র্যাজিক দিকটির বিষয়ে লোরকার একটা প্রত্যয় ছিল বলেই ধারণা হয়। তাই আধুনিক মানসিকতার দ্বারা পরিপুষ্ট হয়েও তিনি একে বাদ দিতে পারেন নি তার কাব্যকর্ম থেকে। বস্তুত, নারীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের এই অনিবার্য ট্র্যাজেডি ইবসেনের নাটকের ধারায় এ যুগে ব্যাপকভাবে সাহিত্যের বিষয়বস্তু হয়েছে। লোরকাকে সেই ধারায় একজন অন্যতম নাট্যকার হিসেবে মেনে নিতে বিশেষ অসুবিধে নেই। বিশেষত লোরকার এই নাটকটির পাত্রীটি যেন ইবসেনের- 'হেড্ডা গ্যাবলার' নাটকের হেড্ডা, আর লিয়োনার্দো যেন লব্‌বর্গ।

৩

বিবাহিতা নারীর মাতৃত্বের আকাঙ্ক্ষা এবং সেই আকাঙ্ক্ষার ব্যর্থতাজনিত ট্র্যাজেডি হচ্ছে লোরকার 'য়েরমা' নাটকের বিষয়। ধনী বাগিচা-মালিক য়ুআন-এর পত্নী য়েরমা বিবাহের পর থেকেই সন্তানের জন্য অপেক্ষা করছে। বছরের পর বছর কাটে, সন্তানসম্ভাবনা দেখা দেয় না। স্বামীর সারা দিন কেটে যায় বাগিচায়, এমন কি কোনো কোনো রাত্রিও বাগিচার যত্নে অতিবাহিত হয়ে যায়। য়ুআন কাজের লোক, পত্নীর মনোভাবকে অনুধাবন করবার মতো তার সময়ও নেই, মনও নেই। কাজেই একাকিত্বের বেদনায় এবং সন্তানহীনতার অন্তর্জ্বালায় য়েরমা অস্থির হয়ে ওঠে। দীর্ঘ দিনরাত্রি তার কাছে অসহনীয় হয়ে ওঠে। ভিকতর নামে একটি প্রাণোচ্ছল ছেলের সঙ্গে কোন এককালে তার একটা রঙিন সম্পর্ক ছিল, সেকথা তার মনে আছে। সেই ভিকতরের সঙ্গে এখনও তার মাঝে-মধ্যে দেখাসাক্ষাৎ হয়ে যায়। ভিকতর য়ুআনের বিপরীত এবং য়েরমার অনুকূল। কাজেই ভিকতরের সান্নিধ্য য়েরমাকে উন্মনা করে রাখে কখনো-কখনো কিন্তু ভিকতর যেমন সংযতস্বভাব ভালোমানুষ, য়েরমাও তেমনি আত্মসচেতন এবং নিজের আর স্বামীর সম্মানরক্ষার সদা-সতর্ক। কাজেই ভিকতর য়েরমার জীবনে কোনো সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় না। তার জীবনের সমস্যা বন্ধ্যাত্ব। ওই বন্ধ্যাত্বের লজ্জা দূর করতে সে 'তুকতাক'-এর সন্ধানে যত্রতত্র ঘুরেছে, তথাকথিত দেবস্থানে হত্যা দিয়েছে, স্বামীর নিষেধ সত্ত্বেও। ফলে একসময় য়ুআন তাকে সন্দেহ করতে শুরু করে। কিন্তু য়েরমার হৃদয় আর চরিত্র আগাগোড়াই নিষ্কলঙ্ক ছিল। স্ত্রীর এই যত্রতত্র ঘোরাঘুরি যে পরপুরুষের জন্য নয়, সন্তানকামনায়, তা একদিন গোয়েন্দাগিরি করতে গিয়ে য়ুআনও বুঝতে পারে। তখন য়ুআন অনেক সোহাগ করে য়েরমাকে বোঝাতে চেষ্টা করে যে, তাদের সন্তানহীনতা এমন একটা ঘটনা যা তাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে। কাজেই এই ভবিতব্যকে শিরোধার্য করে নিয়ে শান্তিতে জীবন কাটানোই ভালো।

অর্থাৎ য়ুআনের কাছে পত্নীর বন্ধ্যাত্বের সমস্যাটা কিছুই নয়, সন্তান ব্যতীতই দাম্পত্য জীবন তার কাছে যথেষ্ট আকর্ষণীয়। কিন্তু য়েরমার কাছে তা নয়। মাতৃত্বের সম্মান যেখানে নেই, সেখানে সে নিজেকে কেবল স্বামীর শোভা বিবেচনা করে লজ্জা পায়। মাতৃত্বসম্মানবঞ্চিত একটি ভোগ্যবস্তুতে সে নিজেকে পরিণত করতে পারে না। তাই য়ুআন যখন তাকে সব কথা বুঝিয়ে শান্তিপূর্ণ দাম্পত্য জীবনে ফিরে আসার আহ্বান জানিয়ে চুম্বন প্রার্থনা করে, ঠিক তখনই সে অকস্মাৎ য়ুআনকে শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যা করে ফেলে। তার সেই সময়কার উক্তিটি স্মরণীয় : বন্ধ্যা! বন্ধ্যা! নিশ্চিত তাই। আসলে এখনই আমার কাছে এটা সত্য, যে আমি বন্ধ্যা! এখন আমি নিশ্চিন্তে ঘুমুতে পারব। চমকে জেগে উঠব না একথা ভাবতে যে আমার রক্তের মধ্যে আরেক নতুন রক্ত এসেছে কিনা। আমার দেহ শুকনো, চিরকালের জন্যই এবার শুকনো! তুমি কী চাও? আমার কছে এসো না, আমি আমার ছেলেকে খুন করেছি। আমি আমার নিজের হাতে আমার ছেলেকে খুন করেছি।

য়েরমার অন্তর্বেদনা আর অন্তর্জ্বালার প্রতি য়ুআন-এর উদাসীনতাই তাকে এই ট্র্যাজিক হত্যাকাণ্ডে প্ররোচিত করেছে অকস্মাৎ। ভিকতর-এর মতো মমতাময় হৃদয় যদি সে তার স্বামীর মধ্যে খুঁজে পেত, তবে হয়তো এই ট্র্যাজেডি ঘটত না। এখানে য়েরমা প্রথমে ভয়ানক দুঃখভোগ করেছে (সাফারড্ সামথিঙ টেরিব্‌ল্) এবং পরে ভয়ানক কাজ করেছে (ডান সামথিঙ টেরিব্‌ল্)। সুতরাং কাহিনী তথা নাট্যবস্তু অবশ্যই ট্র্যাজেডির উপজীব্য।

মাতৃত্বসম্পর্কিত জটিল মনস্তত্ত্ব এই নাটকের কাহিনীর পশ্চাতে থাকায় নাটকটি 'রক্তাক্ত পরিণয়'-এর চেয়ে উচ্চাঙ্গের ট্র্যাজেডি তো হয়েছেই, এমন-কি এই শতকের শ্রেষ্ঠ ট্র্যাজেডি হিসেবে বাছাই কয়েকখানির মধ্যেও এর অন্তর্ভুক্তি সুনিশ্চিত। এই নাটকটির ভাবগত গভীরতা এবং শিল্পগত ঐশ্বর্য এখানেই যে, য়েরমা স্বামীকে হত্যা করে তার বন্ধ্যাত্বের অপবাদ ঢাকতে চেয়েছে বৈধব্যের আবরণে, এবং তার ব্যক্তিত্বের নারী-উপাদানের বস্তুধর্মী সাফল্যের দুর্নিবার প্রয়োজনে সে এই ভয়ানক কাজটি অবলীলায় করে ফেলতে পেরেছে। একটা সর্বনাশকে আড়াল করতে গিয়ে সে করে ফেলল আর-একটা সর্বনাশ। এটাই তার চিন্তা আর কর্মের ট্র্যাজিক দিক। এটা নিশ্চয়ই মাতৃত্বহীনতার অসম্মানমোচনের একটা বিকৃত পন্থা, কিন্তু

এই বিকৃতির মাধ্যমেই ওই অসম্মানের অন্তর্জ্বালার অস্বাভাবিক উত্তাপেরও বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে, যাকে আমরা অবাস্তব বলে অস্বীকার করতে পারি না। ইবসেনীয় নারী-জিজ্ঞাসাকে লোরকা এখানে বিশেষভাবে নারীর মাতৃত্বকেন্দ্রিক ব্যক্তিত্বসমস্যার স্তরে এনে পৌঁছে দিয়েছেন। নারীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য সম্পর্কে আধুনিক য়ুরোপে যে ধ্যানধারণা ব্যাপকভাবে প্রচলিত, তার পরিপ্রেক্ষিতে লোরকা এখানে নারীর আত্মমর্যাদা বিষয়ে একটা ভিন্নতর দিককে উন্মোচিত করেছেন। বিষয়টি আন্তর্জাতিক এবং চিরন্তন, শিল্প হিসেবেও নাটকটি অনুরূপ মূল্যে মূল্যবান।

৪

'হাউস অব্ বার্নারদা আল্‌বা' ("বার্নারদা আল্‌বার সংসার") লোরকার তৃতীয় ট্র্যাজেডিরসাত্মক নাটক। ট্র্যাজেডি হিসেবে নাটকটি উৎকৃষ্ট। এর চরিত্রগুলির বস্তুধর্মিতা এবং স্বাভাবিক জীবন-দ্বন্দ্ব সমগ্র নাটকটিকে মানবরসে পূর্ণ করে রেখেছে। এমন-কি রূঢ়তার অন্তরালে মায়ের জীবনের বেদনাও নাট্যকার অত্যন্ত নিপুণভাবে উপস্থাপিত করেছেন— স্বতঃপ্রকাশিত না হলেও তাকে বুঝে নিতে কষ্ট হয় না।

লোরকার 'রক্তাক্ত পরিণয়' বা 'য়েরমা'র মতো এই নাটকেও ট্র্যাজেডি সংসাধিত হয়েছে নাটকের একেবারে শেষ ভাগে। নাটকটিকে প্রথমে মনে হয় সমস্যামূলক কমেডি, তারপরে মনে হয় 'ট্র্যাজিকমেডি' এবং শেষে অকস্মাৎ নাটকটি ট্র্যাজেডিতে পরিণত হয়ে যায়। এটা লোরকার একটা নিজস্ব শিল্পরীতি বা স্টাইল বলেই মনে হয়। প্রচলিত পঞ্চাঙ্ক নাটকে ট্র্যাজেডি নাটকের তৃতীয় অঙ্কেই সাধারণত ঘটে যায়। তারপর চলতে থাকে ট্র্যাজিক চরিত্রের বা নায়কের দুঃখভোগ। কিন্তু লোরকার এই তিন-অঙ্ক-বিশিষ্ট নাটকের তৃতীয় অঙ্কের যবনিকা পতনের একটু আগে মাত্র হঠাৎ নাটকটি ট্র্যাজেডিতে পর্যবসিত হয়ে যায়। পঞ্চাঙ্ক নাটকের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত ঘটনাসংস্থানের রীতিকে যদি 'কৌণিক সংঘটনা' বা 'অ্যাঙ্গুলার অ্যাকশন' বলি, তবে লোরকার এই রীতিকে 'রৈখিক সংঘটনা' বা 'লিনীয়র অ্যাকশন' বলা যেতে পারে।

স্পেনের গ্রামীণ কুলীন সমাজের ট্র্যাজিক চিত্র এই নাটকে উপস্থাপিত। উনচল্লিশ থেকে কুড়ি বছরের মধ্যে পাঁচটি কন্যার বয়স। এদের নিয়ে সদ্যোবিধবা ষাট বছরের জননী বারনারদার সমস্যা। প্রত্যেকটি কন্যার নিজস্ব জীবনদ্বন্দ্ব এবং সমস্যা রয়েছে। এবং তাদের সকলের সমস্যার সম্মিলিত রূপ হচ্ছে বারনাবদার সমস্যা। জ্যেষ্ঠা-কন্যা অগাস্তিয়াস বারনারদার স্বামীর প্রথম পক্ষের স্ত্রীর কন্যা। অগাস্তিয়াসের ঐশ্বর্য অর্থাৎ সম্পত্তি সর্বাধিক। এর লোভে পেপ এল রোমানো নামে একটি যুবক অগাস্তিয়াসের পাণিপ্রার্থী হয়। কিন্তু তার হৃদয় আকৃষ্ট হয়েছে কনিষ্ঠা কন্যা আদেলার প্রতি। বয়সের বিচারেও আদেলার সঙ্গে পেপ এল রোমানোকে মানায়। আদেলাও তা জানে। তাই সেও পেপ এল রোমানোকে আকাঙ্ক্ষা করতে শুরু করে। রাত্রিতে পেপ যখন অগাস্তিয়াসের সঙ্গে আড়ালে দেখা করতে আসে, তখন পেপ-এর সঙ্গে আদেলার সাক্ষাৎ হয় আরো আড়ালে। এই ব্যাপার অন্য ভগিনীরাও খানিকটা আন্দাজ করতে পারে, কারণ প্রায় প্রত্যেকেই তারা মনে-মনে পেপকে ভালোবাসে, যেহেতু পেপই তাদের কুমারীসভায় আগত এবং বিবাহযোগ্য একমাত্র কুলীনপুরুষ।

এরই ফলে দেখা দেয় পারিবারিক বিশৃঙ্খলা, যা বারনারদা সর্বপ্রকারে পরিহার করে চলতে চান। পরিচারিকা পনসিআ বিবাহযোগ্যা কন্যাদের যে-কোন প্রকারে পাত্রস্থ করার জন্য কর্ত্রী বারনারদাকে অনুরোধ করেছে অনেকবার, বুঝিয়ে বলেছে, অন্যথায় অনাসৃষ্টির সম্ভাবনা। কিন্তু কৌলীন্যের দম্ভে এবং নিজের শাসনের প্রতি অতিরিক্ত আস্থার ফলে বারনারদা পনসিআ-র কথায় কর্ণপাত করেন নি। তাঁর বিবেচনায় উপযুক্ত পাত্র যখন এক শ মাইলের মধ্যেও নেই, তখন মেয়েদের প্রণয় এবং প্রণয়ী-ব্যতিরিক্ত জীবনই কাটাতে হবে, তাঁর সতর্ক দৃষ্টি, কড়া শাসনে সব ঠিক থাকবে, কোনো অঘটন ঘটবে না।

কিন্তু শেষ মুহূর্তে দেখা গেল পনসিআ-র আশঙ্কাই ঠিক। অগাস্তিয়াস-এর কাছ থেকে পেপ-কে ছিনিয়ে নেবার জন্য মারতিরিও এবং আদেলার মধ্যে মারাত্মক ঈর্ষা—কুৎসিত ভগিনী-বিদ্বেষ। গভীর রাত্রির প্রশান্ত নিস্তব্ধতার মধ্যে এই কুৎসিত এবং উগ্র কলহের প্রচণ্ডতায় এই প্রথম বারনারদার নিশ্চিন্ততার ঘুম ভাঙল। তরুণী আদেলার সম্মুখে বৃদ্ধা জননীর প্রাচীন শাসন যে মুহূর্তে ব্যর্থ হল, সেই মুহূর্তেই জননী বারনারদা মঞ্চের নেপথ্যে চলে গেলেন, খুঁজে নিতে বন্দুক। তাঁর সঙ্গে মারতিরিও। বন্দুকের শব্দ শোনা গেল। তারপর বারনারদা মঞ্চে প্রবেশ করে আদেলাকে বললেন, 'যাও, এখন তাকে খোঁজো গিয়ে।' মারতিরিও এসে বলল, 'ওটাতেই পেপ এল রোমানোর সব শেষ।'— এই উক্তি শুনে আদেলা চীৎকার করে পেপ-এর নাম ধরে ডাকতে-ডাকতে তার ঘরে চলে গেল এবং উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করল।

বারনারদার অভিপ্রায় ছিল সমস্ত সমস্যার মূল কারণ পেপ-কে হত্যা করা। কিন্তু (সম্ভবত) মারতিরিও-র নিক্ষিপ্ত গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় এবং উদ্যানে লুকিয়ে-থাকা পেপ পালিয়ে যায়। কিন্তু ইচ্ছে করেই মারতিরিও মিথ্যা কথা বলে যে, ওটাতেই পেপ এল রোমানোর সব শেষ। এবং এই মিথ্যা সংবাদের প্রতিক্রিয়ায় আদেলোর আত্মহত্যা।

আদেলার আত্মহত্যায় একটা ট্র্যাজেডির সমাপ্তি, কিন্তু আর-একটা ট্র্যাজেডির শুরু, এবং তা বারনারদার ট্র্যাজেডি।

একটা ব্যাপারে বারনাদা নিশ্চিন্ত যে তাঁর কন্যা সতীত্ব নিয়ে মৃত্যুবরণ করেছে, সুতরাং তাঁর পারিবারিক সুনাম অক্ষুণ্ণ রইল। কিন্তু এই বাহ্য সাফল্যের অন্তরালে কনিষ্ঠা কন্যার শোচনীয় মৃত্যুতে তাঁর জননী-হৃদয় যে ভেঙে খান-খান হয়ে যাচ্ছে, তা বুঝতে বাকি থাকে না। নিজে তিনি কাঁদছেন না, কাউকে কাঁদতেও দেবেন না, এবং সেই উদ্দেশ্যে ক্রন্দনোন্মুখ অন্য কন্যাদের দিকে আঙুল তুলে নিষেধবাক্য জারি করছেন—

'কাঁদবে, যখন একা। শোকের সমুদ্রে আমরা ডুবে থাকব। বারনারদা আলবার কনিষ্ঠা কন্যা কুমারী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে। তোমরা শুনেছ আমার কথা? এখন, চুপ! চুপ! আমি বলছি, চুপ!'

এই উক্তিটির মধ্য থেকেই হতভাগিনী জননীর নিরতিশয় অন্তর্বেদনা আর কঠোর কর্তব্যের বোঝার নিপীড়ন মূর্ত হয়ে ওঠে। বারনারদার ট্র্যাজেডির এটা একটা সূচনামাত্র—বা তাঁর জীবনব্যাপী ট্র্যাজেডির একটা ইঙ্গিত। ব্রাডলি ট্র্যাজেডির মধ্যস্থিত যে ব্যাপক বিষাদময়তার (প্রোফাউনড সেনস অব স্যাডনেস) কথা বলেছেন, যার মূলে থাকে একটা অপচয়ের দ্যোতনা (ইমপ্রেশন অব ওয়েস্ট), তা এই নাটকে বিদ্যমান। এবং এই অপচয়ের দ্যোতনা নাটকটির মধ্যে করুণার ভাবটিকেও জাগিয়ে তুলেছে—এই ভাবের জাগরণ ট্র্যাজেডির রসগত সাফল্যের একটি শর্ত।

এই নাটকের বারনারদা চরিত্রটি একটি আশ্চর্য সৃষ্টি। আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য মানুষ নিয়তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে থাকেই। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিরুপায় হয়ে সে সবকিছুই মেনে নেয়। জীবনের রণক্ষেত্র থেকে এমন আত্মপ্রত্যাহার মানুষের মধ্যে প্রায় সর্বজনীন এবং স্বাভাবিক। কিন্তু কখনো-কখনো মানুষ সব রকম বিপদের মুখেও নিজের দম্ভ বা দৃঢ়তাকে পরিত্যাগ করে না, ট্র্যাজেজির আবর্তে নিপতিত হয়েও সে নিজের চারিত্রিক অখণ্ডতাকে ধরে রাখতে চায়। এই বিশিষ্ট মনস্তত্ত্ব এই নাটকের বারনারদার মধ্যে পাওয়া যায়। নিজের কুলীন সমাজের মধ্যে প্রচলিত মূল্যবোধগুলির সম্মিলিত সামাজিক শক্তি তাঁর অসহায় জননীরূপকে গ্রাস করে ফেলেছে, এবং সেই শক্তির প্রকোপে তিনি কৃত্রিম শাসনে রাখতে চেয়েছেন তাঁর কন্যাদের, যারা নিজ-নিজ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের শক্তিতে পরস্পরের মধ্যে এবং জননীর বিরুদ্ধে সংঘর্ষে অবতীর্ণ। এই-সব বিভিন্ন শক্তির পারস্পরিক সংঘর্ষে এই নাটকের ট্র্যাজেডি, কোনো শক্তিই তাকে রোধ করতে পারল না। তথাপি শেষমুহূর্তেও বারনারদা এমন ভাব প্রকাশ করছেন, যেন কিছুই হয় নি।

বারনারদার আত্মশ্লাঘা আত্মপ্রবঞ্চনার নামান্তর। কিন্তু পরিবারের যে আভিজাত্য নিয়ে তাঁর এই আত্মশ্লাঘা—তার কোনো বাস্তব ভিত্তি ছিল না। তথাপি তিনি আগাগোড়া তাঁর সেই আত্মশ্লাঘা বজায় রেখেছেন। অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে তাঁর এই আত্মশ্লাঘার ভিত্তিতে ছিল তাঁর মনগড়া সংসার, যাকে তিনি চিরকাল বজায় রাখতে পারবেন বলে ভেবেছিলেন, কিন্তু বাস্তব সংসারের রূঢ় কামনাবাসনার অভিঘাতে তা যখন ভেঙে গেল, তখনও তাঁর ব্যক্তিত্বের মধ্যে অশ্রুকরুণ গর্ব। তাঁর এই বিজয়িনীর ভান তাঁর অন্তরের নিঃস্বতাকেই বাইরে টেনে আনে, এবং নাটকের ট্র্যাজেডিকে আরো ঘনীভূত করে তোলে।

৫

স্পেনের নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে সর্বকালের বিচারে সুন্দর, সার্থক ট্র্যাজেডি বিশেষ পাওয়া যায় না। এমন-কি ক্যালডিরনের মতো খ্যাতনামা নাট্যকারেরও প্রকৃত রসোত্তীর্ণ ট্র্যাজেডি মাত্র একখানি এবং তা-ও স্ত্রীর প্রতি

স্বামীর সন্দেহের মতো একটি বহুপ্রচলিত এবং লোকপ্রিয় বিষয় নিয়ে রচিত। মনস্তাত্ত্বিক সংঘাতের পরিবর্তে পরিস্থিতি এবং ঘটনাগত সংঘাতই ছিল তখন মুখ্য। কাজেই এসবের পরিপ্রেক্ষিতে লোরকা তাঁর সীমিত নাট্যসম্ভারের দ্বারা স্পেনের নাট্যসাহিত্যকে সমৃদ্ধ তো করেছেন-ই, উপরন্তু বিশ্বের নাট্যানুরাগীদের মধ্যেও স্বদেশের নাট্যকলা তথা নাট্য-সাহিত্য সম্বন্ধে সসম্মান জিজ্ঞাসার উদ্বোধন ঘটাতে পেরেছেন।

পাঠকের দৃষ্টিতে

এই সংখ্যায় প্রকাশিত ড. পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের 'বন্ধন-ছেদন' প্রবন্ধটি সম্পর্কে আমরা পাঠকদের মতামত আহ্বান করছি। শব্দসীমা—৫০০। রচনা পাঠাবার শেষ তারিখ ১লা সেপটেমবর. ১৯৮৬।

সংস্কৃতির মন্দ দিক

বশীর আলহেলাল

'অনেক বলা বলেছি সে মিথ্যা বলা,
অনেক চলা চলেছি সে মিথ্যা চলা।'
—রবীন্দ্রনাথ

ভয় হচ্ছে আমি একটা খারাপ বিষয় নিয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছি। জানি না আপনারা বিরক্ত হবেন কিনা। কতকগুলো জিনিসকে আমরা একেবারে প্রশ্নের অতীত করে রেখে দিয়েছি। এগুলোকে অতি পবিত্র বলে মনে করি। যেমন, ধরুন, দেশপ্রেম, জাতীয় ঐক্য বা সংহতি। দেশের মানুষ দেশকে ভালোবাসবে, এমনকি কেউ-কেউ হয়তো নিজের প্রাণের চেয়ে বেশি ভালোবাসবে, এই স্বাভাবিক। কিন্তু তাই বলে প্রত্যেক মানুষ তার দেশকে ভালোবাসবেই, এমন আশা বা দাবি করার কোনো কারণ নেই। ইচ্ছা হলে সে তার দেশকে ভালোবাসবে, না হয় বাসবে না। দেশ যদি হয় তার, সে অধিকার তার আছে। যদি ভালোবাসে, আপনি কেমন করে বুঝবেন ভালোবাসে? আমরা কি বুঝতে পারি বাতাস আমাদের ঘিরে আছে ধরে আছে? মানুষ কখনো কখনো নিজের মাকেই ভালোবাসতে পারে না, এমনকি নিজেকেই ভালোবাসতে পারে না। আমরা অবশ্য গালভরা সব কথা যেমন বলি, মানুষের চেয়ে দেশ বড়ো। কিন্তু আসলে দেশ মানুষের চেয়ে বড়ো নয়। বড়ো মূল্যবান মানুষের জন্ম, তার বেঁচে থাকা, তার জীবনলীলা। কারণ একবারই সে এই সংসারে জীবনের খেলা খেলতে আসে। জীবনলীলা সাঙ্গ হলে তার সব ফুরিয়ে গেল। সে আর থাকবে না। কিন্তু দেশ থাকবে। সেই দেশ কখনো পরাধীন থাকবে, কখনো স্বাধীন হবে। কখনো তাকে বিদেশী, কখনো স্বদেশী, কখনো বিদেশী-স্বদেশী মিলে লুণ্ঠন করবে। এবং যারা লুণ্ঠন করবে তারাই সবচেয়ে বেশি কপচাবে দেশপ্রেমের বুলি, এবং মানুষের কাছে দাবি করবে দেশপ্রেম। মানুষের উপর নির্যাতন চালাবে সে জাতীয় সংহতি বিপন্ন হয়েছে এই অজুহাতে। রাষ্ট্র যখন মানুষের কাছে দেশপ্রেম এবং জাতীয় ঐক্য ও সংহতি প্রার্থনা বা দাবি করে, সে তাকে

বাংলাদেশ থেকে

নির্দয়ভাবে শোষণ করবে বলেই ওই পবিত্র বস্তুগুলি দাবি করে। কাজেই ওই জিনিসগুলোকে যে-রকম পবিত্র মনে করা হয় সে-রকম পবিত্র ওগুলো সব সময় না-ও হতে পারে। তা ছাড়া, ভালোবাসাও সব সময় রক্তের মধ্যে আপনি পাওয়া যায় না, ভালোবাসাও শিখতে হয়। মজার কথা, আপনারা সবাই জানেন, এই উপ-মহাদেশে প্রথম মাত্র উনবিংশ শতকে আমাদের স্বাধীনতা-লুণ্ঠনকারী ইংরেজদের কাছে আমরা জাতীয়তার দর্শন, দেশপ্রেমের বোধ—এই জিনিসগুলো শিখেছিলাম। তারপর দেশ-মায়ের মূর্তি যে গড়া হয়েছে সে বহু প্রকারের। আমার মনে হয়, দেশপ্রেমের আইডিয়া গড়ে তুলতেও বেশ অনেকখানি বিদ্যার প্রয়োজন হয়। ভূগোল, ইতিহাস, নৃতত্ত্ব, কাব্য—এইসব পড়া থাকতে হয়। এই দেশপ্রেম আর জাতীয় সংহতির প্রশ্নে আমাদের নিরন্ন, নিরক্ষর, প্রবঞ্চিত জনগণ শ-দুই বছর আগে ইংরেজরা যখন আসে নি তখন যে অন্ধকারে ছিল এখনো প্রায় সেই অন্ধকারে আছে। দেশপ্রেম দিয়ে তারা করবে কী বলুন? ওতে কি পেট ভরবে? দেশপ্রেম বড়োলোক আর ভদ্রলোকদেরকেই মানায়। কারণ দেশরূপ যে মানসীকে তাঁরা ভালোবাসেন, লুণ্ঠন করে বাস্তবে তাকে যত হতকুচ্ছিতই বানিয়ে দিন না কেন, স্বপ্নে আর কল্পনায় তাকে পুষ্পে রত্নে অলংকারে সাজিয়ে তুলতে তাঁরাই পারেন। এমনকি দেশপ্রেমের ঠোকাঠুকি পর্যন্ত ঘটে যায় ভদ্রলোক আর বড়োলোকদের নিজেদের মধ্যে। রেডিয়ো আর টেলিভিশনে অহর্নিশি বাজতে শোনেন দেশপ্রেমের গান। এইসব গানের সুরের মূর্ছনার মধ্যে অনেক কিছু থাকে। গাছ ফুল লতাপাতা খাল-বিল আকাশ-নদী পাখি, গ্রামের ছায়া। সোনালি ফসলের কথাও থাকে। কিন্তু মানুষের কথা থাকে না। যদি কখনো থাকে সে একতারা-হাতে বাউল কিংবা বাঁশি-হাতে রাখাল। দেশপ্রেম জিনিসটাই আসলে এইরকমের তৈরি রোমানটিসিজম। তাই দেশপ্রেমের পরীক্ষা বা কৈফিয়ত নেয়ার অধিকার কারো নেই। যার কলমে আর গলায় জোর বেশি সেই ওই পরীক্ষায় ভালো ফল করে। তারপর চাকরি তেজারত, শিল্প, কারখানা, রাজনীতি, সাহিত্য, সংস্কৃতি—এইসব করে নিজে ভালো

থাকে এবং অন্যকে ভালো থাকতে দেয় না।

কিন্তু আমি দেশপ্রেমের ডেমাগগির দু দিক সম্পর্কে আলোচনা করতে বসি নি। সংস্কৃতির খারাপ দিক সম্পর্কে দু-একটা কথা বলতে চেয়েছি। তবে ওই দেশপ্রেমের রোমানটিসিজমের সঙ্গে সংস্কৃতির রোমানটিসিজমের ঘনিষ্ঠ মিল রয়েছে বলে অতগুলো কথা বলা হয়ে গেল। তা ছাড়া, আজকাল অপ-সংস্কৃতি বলে একটা ব্যাপারের কথা আমরা বলছি বটে, কিন্তু সংস্কৃতিকেও আমরা জীবনের খুব একটা পবিত্র উদ্ভাস বলে মনে করি। আমি অবশ্য অপ-সংস্কৃতির কথাও আলোচনা করতে বসি নি।

সংস্কৃতি জিনিসটা কী এবং তার এলাকা কতদূর বিস্তৃত, এই সম্পর্কে নানা জনে নানা কথা বলেছেন। সংস্কৃতি মানবের জীবনপ্রয়াসের বিচিত্র মানবীয়, সুকুমার আয়োজন। তবে সাধারণভাবে আমরা সংস্কৃতি বলি নাচ, গান, নাটক, চারুকলা, সাহিত্য, প্রসাধনকলা—এইসবকে। বর্তমান আলোচনায় আমরা সংস্কৃতি বলতে তার এই সাধারণ পরিচয়কেই বোঝাব।

সব মানুষের জীবনের সঙ্গে সংস্কৃতির কোনো-না-কোনো উপাদান জড়িয়ে রয়েছে। কারো জীবনে সংস্কৃতির কোনো ছোঁয়া নেই, এমন হয় না। গ্রামের একটি অশিক্ষিত কায়ক্লিষ্ট নড়বড়ে মানুষেরও যদি একটি ছনের চালের কুঁড়েঘর থাকে, সেই চালের পাট বা ছোবড়ার দড়ির বাঁধনগুলির মধ্যে এমন ছন্দ থাকবে যা দিয়ে এমন কি তার সাংস্কৃতিক গোত্রনির্দেশও করা সম্ভব। যার ওই কুঁড়েটুকুও নেই, দ্বারে দ্বারে অর্ধোলঙ্গ ভিক্ষা করে খায়, তার মাটির সানকির গলায় হয়তো একটু নকশা আছে, কিংবা যে-সুরে সে গান গেয়ে বা আল্লা-রসুলের নামের চিৎকার দিয়ে ভিক্ষা চায়, তার মধ্যে কেবল তার একার নয়, তার বংশের, তার শ্রেণীর, তার দেশকালের সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য ধরা রয়েছে। এমন একজন কট্টর মোল্লাকে পাওয়া সম্ভব যিনি সংস্কৃতিকে কঠোরভাবে এড়িয়ে চলেন। কিন্তু তিনি দু বেলা তেলাওয়াতের পর যে কোরান শরিফটিকে চুমু খান, প্রথমত, এই চুমু খাওয়ার মধ্যে আছে তাঁর সংস্কৃতি, দ্বিতীয়ত, কোরান শরীফের পাতায় পাতায় আছে নকশা, নকশা যদি না-ও থাকে, তার নস্খ্‌ পদ্ধতির লিখনের বিশেষ একটি ধাঁচ অবশ্যই রয়েছে, হতে পারে তার মটিফ বিদেশী, কিন্তু পৃথিবীর অধিকাংশ ধর্মই অধিকাংশ দেশে বিদেশী, এবং ধর্মগুলি হচ্ছে সংস্কৃতির খনি। অতএব সংস্কৃতিহীন পশু-পাখিই হয় কিনা সন্দেহ, সেখানে মানুষের তো প্রশ্নই নেই। যে পশুর-অধম নিরাশ্রয় শিশু উলঙ্গ এসে উলঙ্গ থেকে গেল, সে যদি একফোঁটা দুধ না পায়, যদি মায়ের মুখে কখনো এক-কলি ঘুমপাড়ানি গানও না শোনে, কিন্তু মায়ের কোলে উৎকর্ণ হয়ে যে বুকচাপা কান্না সে শুনবে তার বিশ্বজনীন বেদনাটিকে আকাশে-বাতাসে ভাসিয়ে নিয়ে যায় একটা দেশোয়ালি সুর। তার মধ্যে সেই সংস্কৃতি আছে।

বিশ্ব-সমাজে কোনো দেশ, জাতি বা মানবগোষ্ঠী কতখানি উন্নত আর সভ্য তার প্রধান নিরিখ অবশ্যই তার অর্থনৈতিক অবস্থা। কিন্তু আমরা কখনো-কখনো এই ধরনের কথা বলি, লোকটার টাকা থাকলে কী হবে, রুচি নেই, ম্যানার জানে না, ইত্যাদি। রুচি আর ম্যানারই হচ্ছে সংস্কৃতির পরিচয়ের সার। এই পরিচয়কে ভালো থেকে আরো ভালো করার প্রয়াস যে যতদূর পারছে করছে। এর সঙ্গে অর্থনীতির যোগটা খুব বেশি। অবস্থা যত সচ্ছল হবে, রুচি আর ম্যানারকে উন্নত করার উপায় এবং অবকাশ তত বাড়বে। আমাদের গরিব কিন্তু তথাকথিত ঐতিহ্যসম্পন্ন জাতিই অনেক সময় একটা ভুল অভিমান নিয়ে বসে থাকে যে টাকা হলে কৃষ্টি নষ্ট হয়। টাকা মানুষকে নষ্ট করে সত্য, কিন্তু সে টাকার দোষ নয়, টাকার বৈষম্যের দোষ, কারো অনেক আছে কারো কিছুই নেই—এই পরিস্থিতির দোষ। না হলে, সাধারণভাবে বলা যায়, যে-দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা যত ভালো, তাদের সংস্কৃতি এবং সাংস্কৃতিক প্রয়াসও তত উন্নত। এ কেবল আধুনিক বিশ্বের কথা নয়, অতীতেও যে মানবগোষ্ঠী অর্থনৈতিকভাবে যত সচ্ছল ছিল তাদের সাংস্কৃতিক বিকাশও হয়েছে তত বেশি। একালের উন্নতির মাপকাঠি আর প্রধান সহায় হচ্ছে বিজ্ঞান। এই বিজ্ঞানও আসলে সংস্কৃতির একটা অংশ। এবং সাধারণ অর্থে যাকে সংস্কৃতি বলছি তার সঙ্গেও আষ্টেপৃষ্ঠে আজ জড়িয়ে যাচ্ছে বিজ্ঞান। এবং এর পর সংস্কৃতি পরিস্রুত হতে-হতে তার কতদূর কী রূপ আর চরিত্র দাঁড়াবে আমরা জানি না।

এবং সংস্কৃতির একটা দিকের সমস্যা এর মধ্যে বিরাজ করছে সত্য। সেটা তার আবেগের দিক। সংস্কৃতিকে আমরা স্থূল বৈষয়িক ব্যাপার থেকে আলাদা করে রাখতে এবং দেখতে চেয়েছি। এই উর্ধশ্বাস যান্ত্রিক ব্যস্ততার মধ্যে দম ফেলার একটা শ্যামল সরস

স্থান আমরা ওইখানে খুঁজেছি। এবং তার জন্য ইতিহাস এবং ঐতিহ্যের সঙ্গে সংস্কৃতির যে একটা নাড়ির যোগ রয়েছে বলে মনে করেছি সেটাকে কিছুতে ছিন্ন তো দূরের কথা, শিথিল হতে দিতে চাই নি। যারা ছিন্ন বা শিথিল করতে চেয়েছে তাদের সেই প্রয়াসকে বলেছি অপ-সংস্কৃতি। এবং আমাদের লোক—ঐতিহ্য বা—সংস্কৃতি যে এখনো লুপ্ত হয় নি এটা তার প্রধান কারণ। সংস্কৃতির এই আবেগের মধ্যেই রয়েছে তার সেই ভয়ানক শক্তি, তার সেই মানবীয় আবেদন, তার সেই বিচিত্র-গভীর শিল্প—ও ভাব-রহস্য। এই প্রসঙ্গে ভাববাদী সংস্কৃতি এবং বস্তুবাদী সংস্কৃতির যে দ্বন্দ্ব বা সমস্যা তার বিতর্কে আমরা প্রবেশ করব না। কেবল এইটুকু বলে রাখব যে ভাববাদের মায়াকুঞ্জের পথের হাতছানিই তাকে অনায়াসে টানে। এবং ওইখানেই রয়েছে তার শক্তি, রয়েছে তার দুর্বলতা।

আমরা এই কথাগুলো খুব সংক্ষেপে বলছি।

যার যত শক্তি তার তত মর্যাদা। অর্থের শক্তি সবচেয়ে বেশি। কিন্তু কোনো ব্যক্তির পকেটে বা কোনো জাতির কোষাগারে লক্ষ্মী তাঁর স্থায়ী আসন না পাতলে তার শক্তিও স্থায়ী হয় না। সংস্কৃতির মর্যাদা সেই-রকম সামান্য মর্যাদা নয়, সরস্বতার আসন সে-রকম অস্থির নয়। কারণ সংস্কৃতি সাধারণত কোনো ভুঁইফোড় জিনিস নয়। অপ-সংস্কৃতি ভুঁইফোড় বলেই তা মানুষকে যতই আমোদিত করুক বা নাচাক, তা সেই মর্যাদা পায় না। সেই-যে কে বলেছিলেন, কোনো জাতিকে যদি ধ্বংস করতে চাও, প্রথমে তার সংস্কৃতিকে ধ্বংস করে দাও। এই কথাটার তাৎপর্য হচ্ছে, কোনো জাতির ইচ্ছা, সংকল্প, আশা, এক কথায় তার আত্মিক শক্তি নিহিত থাকে তার সংস্কৃতির মধ্যে, এই আত্মিক শক্তির বল বাহুবল বা অস্ত্রবলের চেয়ে কম নয়। তাই কোনো জাতি যখন সংকটে পড়ে, তার স্বাধীনতা বিপন্ন হয় বা তার স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের লড়াই শুরু হয়, তখন সংস্কৃতির ডাক পড়ে। কারণ তার জাতীয় আবেগের এবং জাতীয় চেতনার গভীর সুরটি সংস্কৃতি ধারণ করে থাকে, এবং সংস্কৃতির মাধ্যমেই তার ভালো প্রকাশ হতে পারে। এর সাক্ষাৎ প্রমাণ আমাদের দেশেই আছে, আমরা তা জানি। পাকিস্তানে বাঙালিকে শোষণ করার সহায়ক পন্থা-রূপে তার সংস্কৃতিকে ধ্বংস কিংবা অন্তত দুর্বল করে দেয়ার চক্রান্ত হয়েছিল। কিন্তু এত বড়ো একটা জাতির এত বড়ো সংস্কৃতিকে ধ্বংস করা যায় না। পশ্চিম-পাকিস্তানিরা ভুল করেছিল বলতে হবে। কারণ সেই দ্বন্দ্বে বাঙালির সংস্কৃতি আরো শানিত হয়েছিল এবং সে তখন তার আরো সুদূর ঐতিহ্যের সন্ধান করতে লেগে গিয়েছিল। তারপর মুক্তিযুদ্ধ যখন বেধে গেল, তার সেই সংস্কৃতি কী উন্মাতাল কাণ্ড করেছিল তা আমরা জানি। যুদ্ধ বাধলে আমরা যে অস্ত্র ব্যবহার করেছি বা ভবিষ্যতে করব তা যতই আধুনিক হোক, তা ধার-করা। কিন্তু সংস্কৃতির শক্তি আপন হৃদয়ের শক্তি, ওর ক্ষমতা চিরায়ত। মাও সে-তুঙ যে বলেছিলেন, বন্দুকের নলই সকল শক্তির উৎস, কথাটা ভুল নয়, কিন্তু সব সময় একটা পটভূমির কথা মনে রেখে ওই সত্যটাকে বুঝতে হবে। বন্দুক উভয় পক্ষের হাতেই থাকে, পাকিস্তানিদের হাতে ছিল, বাঙালিদের হাতেও ছিল। বাঙালিদের হাতে যদি বন্দুক না থাকত তারা স্বাধীনতা পেত না। তা ছাড়া, এর আরো একটা দিক আছে। সংস্কৃতিকে রক্ষা করার জন্যেও বন্দুকের দরকার হতে পারে। 'একটি ফুলকে বাঁচাব বলে যুদ্ধ করি', গানের এই বিখ্যাত কলিটির মধ্যে যতই জোলো আবেগ কাজ করুক না কেন, বন্দুক ছাড়া গতি সত্যি নেই। কিন্তু একহাজার স্বয়ংক্রিয় রাইফেলের চেয়ে সামান্য একটি গান যে কখনো-কখনো যুদ্ধজয়ের পক্ষে উপযুক্ততর অস্ত্র হতে পারে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

তবে সংস্কৃতির মন্দ দিকের ইঙ্গিত আমরা ইতিমধ্যে পেয়ে গেছি। সংস্কৃতি মানুষের জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে, যেমন আলো-হাওয়া জড়িয়ে রয়েছে। বৃষ্টি যেমন মাটিকে স্নাত করে, সংস্কৃতি তেমনি আমাদের জীবনকে স্নাত করছে। কিন্তু কখনো-কখনো বৃষ্টি অতিরিক্ত প্রবল হলে বন্যা হয়। তাতে আমাদের সহায়-সম্বল, বর্তমান, ভবিষ্যৎ ভেসে যায়। বৃষ্টি কেবল প্রবল হলেই বন্যা হয় না। নদী-নালা খাল-বিল মজে গেলে বন্যাটা সহজে হয়। কখনো অন্য দেশের উঁচু-মাটির ঢল থেকেও বন্যা হয়। সংস্কৃতির ঢলও মানুষের সমাজকে আপ্লুত করে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে। তার কর্ম আর চেতনার নদী-নালাগুলি যদি বন্ধ হয়ে থাকে, তাহলে সেই সমাজ সেই সংস্কৃতির প্লাবনে আরো নিরুদ্দেশ ভেসে যেতে পারে।

এই পরিস্থিতিটাকে অদ্ভুত মনে হতে পারে। কিন্তু এমন হয়। কোনো-

কোনো সমাজ বা জাতি তার বিশেষ বিশেষ গুণ বা বৈশিষ্ট্যের জন্যে বিখ্যাত হতে পারে। যেমন, কেউ সমর-শক্তি ও-কৌশল, কেউ অর্থ-সম্পদ, কেউ জ্ঞান-বিজ্ঞানের জন্যে বিখ্যাত হতে পারে। কোনো সমাজ বা জাতি তার সাংস্কৃতিক সম্পন্নতার কারণেই বিখ্যাত ও প্রশংসিত হতে পারে। এবং সাংস্কৃতিক বিত্তের যে আরো বিশেষ মর্যাদা তা পূর্বে দেখেছি। তখন বলি, অমুক জাতি বড়ো সংস্কৃতিমান জাতি। অর্থ-শক্তি ও সমর-শক্তির পাশে সংস্কৃতির বিশেষ মর্যাদার একটা কারণ এই হতে পারে যে, নানাভাবে হঠাৎ বড়োলোক হওয়া যায় এবং তার দ্বারা অস্ত্রবলও আয়ত্ত করা যায়, কিন্তু সংস্কৃতির শিল্প হঠাৎ করে আয়ত্ত করা যায় না, তার থাকে দীর্ঘ প্রক্রিয়া আর পশ্চাৎ-ইতিহাস। টাকা থাকলে, ধরুন, ছবি দিয়ে কি গানের ক্যাসেট দিয়ে ঘর ভরে ফেলা যায়, কিন্তু তাতে করে সংস্কৃতির দেবতা ঘরে অধিষ্ঠিত হন না। বাঙালিও তার কোনো-কিছুর জন্যে না হোক, সংস্কৃতির জন্যে গর্ব করে এসেছে। সে-গৌরব তার ন্যায্য গৌরব। বিশ্ব-সভায় এর জন্যে যদি কোনো প্রশংসা সে পেয়ে থাকে তা তার ন্যায্য পাওনা।

কিন্তু বাঙালি সংস্কৃতিতে উন্নত কেন হল? এর কি কোনো ঐতিহাসিক তথা সমাজতাত্ত্বিক কারণ আছে? অবশ্যই আছে। কিন্তু সে-বিশ্লেষণ আপনারা অন্যখানে দেখে নিতে পারবেন। তবে এ কি তার কোনো মজ্জাগত দুর্বলতা? তার টাকা হয় নি বলে সংস্কৃতি হয়েছে, এইরকম ব্যাপার নাকি? উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ের কথা। ওই সময় পর্যন্ত লর্ড কর্নওয়ালিস ব্রিটিশ ঈস্ট ইনডিয়া কোমপানির নিয়ম করেছিলেন দেশী লোক এক-শ টাকার বেশি-মাইনের সরকারি চাকরি পাবে না। ওই নিয়ম তুলে দেয়া হয়। তখন ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙালি ব্যবসা-বাণিজ্য ছেড়ে দিয়ে ছুটল চাকরির দিকে। যার জন্যে দেখবেন বাঙালির গল্পে-উপন্যাসে শান্ত চাকরি-জীবনের বাস্তব-উৎপাতহীন মেদুর-বিধুর রোমানটিক যত আলেখ্য। কিন্তু এই তর্কটার মধ্যেও আমরা প্রবেশ করতে চাই না। ঐতিহাসিক ও সমাজতাত্ত্বিক কারণ যাই হোক না কেন, বাঙালি তার বৈশিষ্ট্যকে ধুয়ে ফেলবে কেমন করে, ধুয়ে ফেলবেই বা কেন?

তবে, একালে কেন, কোনো কালেই কেবল সংস্কৃতিকে নিয়ে বাঁচা যায় না। বাঙালি কেবল সংস্কৃতিকে নিয়েই এতকাল বেঁচে রয়েছে, একথাও মোটেই সত্য নয়। বাঙালির আর-একটা গৌরবজনক সুনাম আছে, সে স্বাধীনতাপ্রিয়। অবশ্য আমরা যত বলি, এ-দাবি ততটা সত্য না হতে পারে। তবে বাঙলার ছোটো-বড়ো নৃপতি, জমিদার থেকে ফকির, সন্ন্যাসী, ধর্মনেতা এবং বিপ্লবের উদ্‌গাতা কালে-কালে ক্রমাগত তাঁদের আপোসহীন অনমনীয় স্বাধীনচিত্ততার পরিচয় দিয়ে এসেছেন। আর এই-কালে, ১৯৭১ সালে, বাঙালি তার একটা খুব ভালো পরিচয় দিয়েছে। তবে ঐতিহাসিক এবং সমাজতাত্ত্বিক কারণেই বাঙালি তার স্বাধীনতাকে এবং স্বাধীনতার মর্যাদাকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে না, এইরকম বেপরোয়া এবং দায়িত্বজ্ঞানহীন কথা আমি বলতে চাই না। যদি সেটা সত্যি হত তাহলে বর্তমান আলোচনার আর দরকারই হত না। অবশ্য এমন লোক আছেন দেখেছি যাঁরা ওই তত্ত্বে বিশ্বাস করেন। বাঙালি হয়েও তাঁরা বাঙালিকে খুব ছোটো চোখে দেখেন। বর্তমানে উভয় দিক থেকেই সময় চলছে খুব খারাপ। একদল জাতীয়তার অহমিকার ধোঁয়ায় অন্ধ হয়ে আছেন, একদল জাতীয়তা থেকে ধর্ম যা-কিছু ভালো-ভালো মানবপরিচয় আছে তার মুখোশ এঁটে সমাজকে শোষণ আর লুণ্ঠন করছেন। তাই স্পষ্ট করে বলতে চাই, আমার বাঙালি জন্মের জন্যে আমি গর্বিত। এবং আমি মনে করি না বাঙালি বলেই বাঙালি ছোটো, অক্ষম বা অপরিণামদর্শী। কিন্তু সেই সঙ্গে একথাও বলতে হবে যে বাঙালি বলেই বাঙালি বিহারীর চেয়ে বড়ো নয়। জাত্যভিমানের চেয়ে মানুষের মানবীয় অভিমান নিশ্চয় অনেক বড়ো জিনিস। জাত্যভিমান দিয়ে সাময়িকভাবে কতকগুলো কাজ উদ্ধার করা যায়, কিন্তু জাত্যভিমান হুলুস্থুল আবেগের ভেতর দিয়ে যে-সমাজের পত্তন করে বা যে-সমাজ গড়ে তোলে তা শোষক-শোষিতের বিভক্ত সমাজ। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের অন্তর্গত দুর্বলতার কথা কেউ বলতেই চান না, ভয় পান। আমিও বলতে চাই না, ভয় পাই। ভয় ওই জাত্যভিমান।

তবু মুক্তিযুদ্ধের কথা ঘুরেফিরে আসে। মুক্তিযুদ্ধের কালে মুক্তিযুদ্ধের শত্রু ছিল, মুক্তিযুদ্ধের শত্রু এখনো আছে। কিন্তু সমাজের এই অবস্থা কেন? আজ আমাদের কেউ কিন্তু বলে না সে মুক্তিযুদ্ধের শত্রু। বরং মুক্তিযুদ্ধের তথাকথিত চেতনা আর ভাবমূর্তি ছিনতাই হয়ে গেছে। এখন মুক্তিযুদ্ধের চেতনা নিয়ে অন্য পক্ষও দেশ গড়ার কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে আহ্বান জানাচ্ছেন। ওই মুক্তিযুদ্ধের মধ্যে তাহলে কোথাও ত্রুটি ছিল। ওটাকে যার যেমন খুশি কাজে লাগানো যায়। পৃথিবীতে ত্রুটিহীন গণ-আন্দোলন বা এমন কি মুক্তিযুদ্ধ ঘটেছে কিনা আমি জানি না। কিন্তু সেই আন্দোলন বা মুক্তিযুদ্ধের মধ্যেই থাকতে হয় সেই ত্রুটিকে অতিক্রম করে এগিয়ে চলার অন্তর্নিহিত শক্তি ও মেকানিজম। সেই শক্তির পরিচয় আমাদের মুক্তিযুদ্ধ দিতে পারে নি। তা বন্ধ হয়ে গেছে। বাঙালির একটা বড়ো পরিচয় বোধ হয় এই যে সে আত্মসমালোচনা জানে না। এত যে করুণ এবং নোংরা অবস্থা, কিন্তু সে বড়ো আত্মতৃপ্ত, আত্ম-প্রশংসায় মগ্ন।

যাই হোক, এইভাবে বদ্ধ হয়ে গেলে কী হয় তা বলেছি। তখন উপচে পড়ে। আমাদের সমাজে এখন সংস্কৃতি উপচে পড়ছে। যা উপচে পড়ে তা ফেনা, তার ওজন কম বলেই শব্দ ছাড়ে আর ওপরদিকে মাথা তোলে। সমৃদ্ধ, গভীর ও বেগবান সংস্কৃতি যে হচ্ছে, তা নয়। কিন্তু তার চেয়ে বড়ো কথা, যে-সংস্কৃতির এত শক্তি, এত মর্যাদা তার এইরকম মন্দ দিকটি তাহলে রয়েছে। আমি আগে বন্যার উপমা দিয়েছি। আরো একটা উপমা হয়। বাতাস কোথাও গরম হয়ে হালকা হয়ে গেলে উর্ধ্বে উঠে যায়, সেখানে শূন্যতার সৃষ্টি হয়, সেই শূন্যপূরণের জন্যে তখন ছুটে আসে অন্য বাতাস, তাতে ঝড় হয়। এই ঝড়ের কোনো স্থায়ী মূল্য নেই। সংস্কৃতি, সে-প্রয়োজন দেখা দিলে, অবশ্য ঝড় তুলতে পারে, কিন্তু সংস্কৃতি ঝড় নয়, সে উড়ু হাওয়াও নয়। আমাদের সমাজে এখন শূন্যের সৃষ্টি হয়েছে, তাই সংস্কৃতির উড়ু হাওয়া বইছে। নাচ, গান, আবৃত্তি, টেলিভিশনের নাটক খুব চলছে। ঘরে-ঘরে গানের চর্চা বেড়েছে। কিন্তু লক্ষ করবেন, অধিকাংশ পরিবারে, নাচ-গান যা করার মেয়েরাই করুক, এই হচ্ছে মনোভাব। অর্থাৎ সংস্কৃতির প্রতি সমগ্র অনুরাগ নেই। রবীন্দ্র-সংগীতের প্রতি বাঙালি-তনয়াদের ইদানীং অসম্ভব প্রণয় দেখে আমরা খুবই আনন্দিত। কারণ বাঙালির আবহমান সংস্কৃতির বিরোধীরা এক সময় রবীন্দ্রনাথকে অপদস্থ করার চেষ্টা করেছিল। তারা মূর্খ, তাই এ-কাজ করেছিল। তার অপরিহার্য প্রতিক্রিয়া-রূপেই রবীন্দ্রপ্রেম শতগুণ বেড়েছে। 'পঞ্চশরে ভস্ম করে করেছ এ কী সন্ন্যাসী, বিশ্বময় দিয়েছ তারে ছড়ায়ে!' যেন সেইরকম ব্যাপার। আমার মনে হয়, আমাদের সমাজে রবীন্দ্রপ্রেম সাধারণভাবে রবীন্দ্র-অপ্রেমের প্রতিক্রিয়া মাত্র। এখন সেটা ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফ্যাশন কিন্তু প্রেম নয়। আর প্রেম হয়ই বা যদি, এত প্রেম কেন? প্রেমও তো ওই প্লাবনের মতোই একটা জিনিস। আজ আছে, কাল নেই। সাধারণ মধ্যবিত্ত সহজ আনন্দকে নিয়ে মাতবে, এ স্বাভাবিক। কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে তাঁর সমগ্রটাকে নিয়ে জানতে হবে। সেটাই রবীন্দ্রনাথের স্থায়ী মূল্য। বাঙালি যদি রবীন্দ্রনাথের কেবল গান আর নাটককে নিয়ে পড়ে থাকে তাহলে দেখবেন তাঁকে সে অল্পকালেই ভুলে যাবে। রবীন্দ্রনাথের গান গেয়ে মুক্তিযুদ্ধে প্রেরণাসঞ্চারের চেষ্টা খুব করেছি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক এবং জাতীয়তা-সংক্রান্ত বিশ্বাস আর বিবেচনা কী ছিল, তার সঙ্গে আমাদের মুক্তিযুদ্ধকে মিলিয়ে দেখার কথা কি কখনো ভেবেছি?

কিন্তু সত্যি সংস্কৃতির এই প্লাবন কিংবা উড়ু হাওয়া কেন? কেউ হয়তো আমার কথাটাকেই তাঁর পক্ষে টেনে নিয়ে বলবেন, দেশে রাজনীতি নেই, গণস্বার্থের আন্দোলন নেই, সেই শূন্য পূরণ করতে সংস্কৃতির চর্চা বেড়েছে। বন্যা হলেও পরে পলি জমে, তাতে ভালো ফসল হয়। সবটাই ব্যর্থ হতে পারে না। ফেনা হাওয়ায় মিলিয়ে গেলে তলানি যা থাকবে তা পরিমাণে কমও যদি হয়, তার মূল্য আছে। পশ্চাৎপদ সেই মুসলমান বাঙালির মনের আগল খুলে গেছে, নর্তন-কুর্দন তো একটু হবেই।

কিন্তু এ হিন্দু-মুসলমানের প্রশ্ন নয়, এ হচ্ছে সমাজপরিস্থিতির প্রশ্ন। মুসলমান বাঙালি একসময় সংস্কৃতিচর্চা না করে পিছিয়ে পড়েছে, এটাও আসলে সমস্যা। এবং সংস্কৃতিচর্চা যা হচ্ছে সেও একটা নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে। ব্যাপক জনগণের জীবনে এর ছোঁয়া সামান্য। কিন্তু সংস্কৃতির এক ধরনের ফোয়ারা খুব ছুটছে। মধ্যশ্রেণী যখন অপরাধবোধে ভোগে তখন এইরকম কাণ্ড ঘটে। রাজনীতিকে সেই গড়েছিল কিংবা গড়ার চেষ্টা করেছিল, সেই নষ্ট করেছে। রাজনীতি নেই তো সংস্কৃতি আছে। মধ্যশ্রেণী মহানন্দে নেচে-গেয়ে দিন কাটিয়ে দিচ্ছে। মধ্য-শ্রেণী প্রগতি আর বিপ্লবের ভঙ্গি সব সময় করে। সে রাজনীতিহীন শূন্য

অবস্থায় এইরকম ভঙ্গি করে যে সে সংস্কৃতির কোমল কণ্ঠে বিপ্লবের কঠিন গান গেয়ে চলেছে। কিন্তু আসলে সে তখন রাজনীতিকে ভোলার জন্যেই সংস্কৃতির সাড়া জাগিয়েছে। সংস্কৃতিহীন রাজনীতি যেমন চলে না, রাজনীতিহীন সংস্কৃতিও তেমনি চলে না।

একটা বড়ো সমস্যা হচ্ছে এই সংস্কৃতির সঙ্গে জনগণের খুব একটা সম্পর্ক নেই। সম্পর্ক থাকার কথা নয়। তবে বৈঠকখানার সংস্কৃতিরও সমাজে গুরুত্ব থাকতে পারে, তা সমগ্র সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করতে পারে। সেটা হচ্ছে তথাকথিত বিশুদ্ধ সংস্কৃতি। ভদ্রলোকের ছেলেমেয়েদের সংস্কৃতির ভাষা গ্রামের চাষাভুষো কি মিল-কারখানার শ্রমিক-মজুর বুঝবে না। তার জন্যে ভদ্রলোকের ছেলেমেয়েদের দোষ দিচ্ছি না। এই শ্রেণীপার্থক্যের দুস্তর ফাঁক বিপ্লব সফল না হলে কমে না। কিন্তু রাজনীতির ময়দানে জনগণকে ডেকে এনে তাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা হচ্ছে বারংবার। সেই বিশ্বাসঘাতকতা আর ব্যর্থতার নোংরা চেহারাটাকে ঢেকে রাখার কাজে সংস্কৃতি বেশ ভালো সহায়। সংস্কৃতির ঊর্ধ্বলোকে বসে মন্ত্র আউড়ানো হয়, সংস্কৃতি ঐতিহ্য, সংস্কৃতি কোমল, সংস্কৃতি পবিত্র। অপমানিতের তপ্ত মাথার উপর সংস্কৃতির শীতল জলের কল ছেড়ে দেয়া হয়। তাতে সবদিক রক্ষা পায়।

ধরুন, আমরা মেয়েদের কপালের টিপ আর নববর্ষের পথের আলপনা নিয়ে মুখে বহু ফেনা তুলেছি; যেমন আমরা বাঙালি, না বাংলাদেশী—এই নিয়ে বহু তর্ক ভেঁজেছি। এইগুলো হচ্ছে কালতু বিতর্ক। এইসব বিতর্কের সঙ্গে জনগণের স্বার্থ এবং সংস্কৃতির কোনো সম্পর্ক নেই। জনগণের শত্রুরা জনগণের মিত্র মধ্যশ্রেণীকে এইরকমের সব বাজে বিতর্কের জালে জড়িয়ে ফেলে তাদের আসল অপকর্ম সমাধা করে নেয়। মজার কথা, কপালের টিপ আর পথের আলপনা ইসলামসম্মত কিনা তাই নিয়েও বিতর্ক হয়। এবং তর্কটা যদিও এখন ইসলাম-ঘটিত, ইসলামি ন্যায়শাস্ত্রের অধিকারী যাঁরা তাঁদের ফতোয়াকে নাক সিঁটকে অবজ্ঞা করা হয়। (এই সুবিধাবাদ সম্পর্কে আমার বারান্তরে আলোচনা করার ইচ্ছা আছে।) সংস্কৃতি শুধু বিনোদন নয়, সংস্কৃতির উদ্দেশ্য আছে, এই তত্ত্বে যাঁরা বিশ্বাস করেন তাঁরা অবশ্যই জানেন, রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে সংস্কৃতির গুণ এবং পরিমাণের সংগতি থাকতে হয়। মানুষের ভাগ্য সর্বত্র মার খাচ্ছে। যারা মার দিচ্ছে তাদের নানা রকমের কৌশল আছে। সংস্কৃতিকেও তারা সেই মার হিসাবে ব্যবহার করে। সে আঘাত ফুলের আঘাত। কখনো-কখনো ফুলের আঘাত চাবুকের আঘাতের চেয়ে দেহকে কম অবশ করে না।

প্রগতি-আন্দোলন বা জনগণের আন্দোলনের পক্ষে আবেগসৃষ্টির কাজে সংস্কৃতি বৃহৎ ভূমিকা পালন করে। এমনকি জনযুদ্ধে তা শানিত অস্ত্রের কাজ করতে পারে। কিন্তু সংস্কৃতি মাত্রই সে-আবেগ সৃষ্টি করে না, বা সংস্কৃতি মাত্রই শানিত অস্ত্র নয়। সংস্কৃতি এমনিতে কিছু কুহকিনী তো বটেই, তার কিছু মোহিনী ক্ষমতা তো আছেই। সংস্কৃতিকে গণ-আন্দোলন বা জনযুদ্ধের কাজে লাগাতে গিয়ে অনেক সময় দেখা যায় তার কর্মীরা সংস্কৃতির তুফান ক্রমে-ক্রমে এমন জাগিয়ে তোলেন যে রাজনীতি তখন গৌণ হয়ে যায়, তখন মনে হয় সংস্কৃতিই তাঁদের সকল সাধনা, সকল আরাধনা। রাজনীতি বা সংগ্রামের প্রকৃত লক্ষ্য থেকে আন্দোলন এবং আন্দোলনের উদ্দেশ্য বহু দূরে সরে যায়, এবং রাজনৈতিক ব্যর্থতা এমন এক সাংস্কৃতিক মূর্ছনার ভেতর দিয়ে ঘটে যায় যে ব্যর্থ যে হয়েছে রাজনীতি তা বুঝতে বেশ সময় লেগে যায়। মধ্যশ্রেণীর স্বভাবের মধ্যে এবং তাঁদের সংস্কৃতির মধ্যে এমন গুণ আছে যাতে করে তার যত চর্চা হয়, তত তা মার্জিত হয়। এই মার্জিত সংস্কৃতি দিয়ে সংগ্রামের আসল কর্মী সর্বহারার সঙ্গে মধ্যশ্রেণীর সম্পর্ক যে হয় তা-ও নয়। বরং তা ক্রমাগত ব্যবধান সৃষ্টি করে। তাতে ভদ্রলোকের ছেলেমেয়েদের ক্ষতি হয় না, কারণ সংস্কৃতির মধ্যেই আছে তাঁদের রুজি-রোজগার। কিন্তু তাতে জনতার সংগ্রাম এবং বিপ্লবের সম্ভাবনার ক্ষতি হয়।

এই ব্যাপারটা বোঝার মতো মনই এখন বাংলাদেশে আছে কিনা সন্দেহ। সব বিপ্লবী প্রয়াস নষ্ট ভ্রষ্ট হয়ে গেছে। দেশের শোষিত সর্বহারার জন্যে কোনো আন্দোলন নেই, তার কিছু-কিছু ভঙ্গি আছে। লেনিন যাকে শুয়োরের খোঁয়াড় বলেছিলেন, সেই খোঁয়াড়ের শুয়োরের সংখ্যা বাড়ানোর জন্যে আন্দোলন করছেন 'জনগণের' পার্টি। কাজেই সংস্কৃতির ওপরে রাজনীতিকে স্থান দেয়া হবে এমন আশা করা যায় না।*

---

* ১লা নভেম্বর, ১৯৮৫ বিজ্ঞান সংস্কৃতি পরিষদের সভায় পঠিত।

গ্রামীণ মুসলিম সমাজ : বিবর্তনের সাম্প্রতিক দৃশ্য

একটা শতাব্দী যখন 'যাই-যাই' করে প্রস্থানের দরজার কাছে পৌঁছে যায়, আমরা তখন স্বভাবতই তার প্রবেশ থেকে সমস্ত পথের দৃশ্য নিয়ে ভাবতে বসি। সেই মুহূর্তের কাছে আমরা এনে হাজির করি প্রকৃতি, মানুষ, সমাজের তুল্যমূল্য একাল ও সেকাল। সেইরকম একটা সময়ে আমরা গ্রামের মুসলিম সমাজে দাঁড়িয়ে যদি পেছনের পানে সতর্ক চোখ ফেলি, নিরবচ্ছিন্ন বিবর্তনপ্রক্রিয়ার কিছু পর্যায়চিত্র আমাদের দৃষ্টিতে ধরা পড়বে সহজেই। আমরা দেখতে পাব, সব রকমের চেতনাকেই আমরা বাস্তবের খুব কাছাকাছি দাঁড় করিয়ে পর্যবেক্ষণ করতে কতখানি তৎপর হয়েছি। এবং আমরা ধ্যানধারণারীতিনীতিবিশ্বাসকে যুক্তি দিয়ে কতখানি পরখ করে নিতে পারছি।

সময়টা ১৯৭০ থেকে ৭৫ হবে। আমার পিতৃদত্ত নাম রফিউদ্দিন, গ্রাম রসুই। চাষের জমি, পুকুর, গাছগাছালি, বর্ষার পথে একহাঁটু কাদা আর বর্ষাহীন ঋতুতে একবুক ধুলো নিয়ে বয়স বাড়ছে। শৈশবের অজ্ঞতা থেকে মাথা তুলে ওই সময়ে এই সমাজকে একটু-একটু করে বুঝে নিতে পারছি। মসজিদে ভোরের আজান—আচ্ছালাতু খায়রুম মীনান্নায়ুম শুনে ঘুম ভাঙাতে উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকতুম রোজ। বড়-র কায়দায় যা দেখেছি—অজু করে পাক্ পবিত্র হতুম। টুপি মাথায় মসজিদে ছুটতুম। আমি তখন ১০-১২তে। জাঁকিয়ে মিলাদ হত এবাড়ি ওবাড়ি; সুর করে কোরান শরীফ তেলাওয়াত করতেন হুজুর সাহেব, ওয়াজ নসীহত করতেন। চারপাশ ঘিরে আর্ত-নীরব গ্রামের বয়স্ক মুরুব্বিগণ। আর দেখতুম, হুজুরের সামনে সেদ্ধ ডিমের প্লেট, গরম দুধের গ্লাস।

এসব আমায় বেশ টানত। সবেবরাতের কিংবা সবেকদরের রাতে মসজিদে বসে-বসে দুর্বোধ্য আরবি আয়াত শুনে খুবই পুণ্যবান মনে হত নিজেকে। ভরতি হলুম মক্তবে। আরবি পড়তে শিখলুম। একাধিক ছরা মুখস্থ করলুম খেটেখুটে (অর্থ কিছুই জানা হল না)। ওই বয়সেই সিদ্ধান্ত নিলুম, পড়তে হলে মাদ্রাসাতেই পড়ব, নতুবা নয়। গ্রামে-গ্রামে ধর্মসভার মাইকের সামনে নসীহত করব, যেন সবাই সমস্বরে কাঁদবে—

বলবে, আমার উপায় বলুন হুজুর। আমি ইহকাল নিয়েই মেতে আছি। স্বজনসংসার আর বিষয় ছাড়া কিছুই শিখি নি। আল্লা রসুলের নৈকট্যকে তুচ্ছ করে অহঙ্কারী হয়েছি। আমার মাগ্‌ফেরাত বলুন।

ঘটনাক্রমে আমার সে সাধ পূর্ণ হয় নি। আমার পিতা, গ্রামের মুরুব্বিগণ অমন অভিলাষে প্রভূত সুখী হয়েছিলেন, অথচ আশ্চর্যভাবে আমি স্কুলকলেজের ছাত্র হয়েছি। আমার হবার কথা ছিল হুজুর সাহেব। অথচ আমি হয়েছি হুজুর সাহেবের একেবারে উলটো। তাতে মোটেই বিস্ময় জাগে না আমার। বিস্মিত হন—মিলাদমহফিলে যাঁদের পাশে সেদিন অবাক বাধ্যতায় চোখ মুছতুম—তাঁরা।

ঐসলামিক অহংকারে বেঁচে থাকা কত যে কঠিন, তা এখন বুঝি। বুঝি বলেই বলতে শিখেছি, মানুষ না হলে আমার 'মুসলমানত্ব' মূল্যহীন। যদি বলতে পারি, ইসলাম শান্তি শিখিয়েছে, ঐক্য শিখিয়েছে, সমতা শিখিয়েছে, মানবিকতা, ন্যায়প্রতিষ্ঠা শিখিয়েছে—তবেই হব মুসলমান। পৈতৃক সূত্রে আমি মুসলমান হতে পারি নে, আল্লাহ রসুলের অস্তিত্বে বিশ্বাস আনলেই আমার ধর্ম ইসলাম হতে পারে না। জ্ঞান, বিবেক, কার্যাবলী দিয়েই তাকে অর্জন করতে হয়। এ কথা ধর্মের। মানুষের কথা। অহংকার দিয়ে অজ্ঞতা বা দুর্বল দৈন্য ঢাকবার নাম ঋণাত্মক ঔদ্ধত্য। এখন আমি বলতে পারি, ইহকাল, এই পার্থিব জগৎ থাকছে বলেই পরকাল, অপার্থিব জগৎ থাকবার প্রশ্ন।

আমার জন্ম, বাড়বাড়ন্ত সবই আজ গ্রামের গণ্ডিতে। পাড়াপড়শির সবাই প্রায় মুসলমান। জীবিকা তাদের জমি। সেইখানে আমার দেখা দিনগুলোর মধ্যেই সমাজচিন্তার দ্রুত পরিবর্তন লক্ষ্যে এসেছে। শৈশবে দেখেছি একটা ভাঙাচোরা প্রাইমারি স্কুল আর একটা শ্যাওলাপড়া মসজিদ নিয়ে গ্রামের মানুষ অতিসুখে আছেন। মতপার্থক্যের কারণে ক্রমে স্বল্প দূরত্বে আরো একটা মসজিদ গড়ে উঠল। মসজিদে সকালে আরবি পড়া শেখানো

হত, দ্বীনিয়াতের শিক্ষা চলত। আরবি শেখানো বলতে, আলেফ্, বে, তে, ছে ইত্যাদি অক্ষরজ্ঞান, শব্দগঠন, আম্‌পারা, কোরান শরীফ পাঠ করা।

অর্থ-জ্ঞান কারোরই ছিল না। না হুজুরের, না পড়ুয়ার। শেখানো হত না ব্যাকরণও। ফলত চোখের পড়াতেই পরম আত্মসুখ, আর কোনো কৌতূহল নয়। এবং একেবারে বেহেশ্‌তের ভাষাকে এইভাবে অর্জন করাটাই মুসলমান হিসেবে বিশেষ গুণ বলে চিহ্নিত হত। কিছু ছেলেমেয়ে নিয়ে চলত স্কুল। স্কুলের ছেলেদের আবার অনেকেই হাইস্কুলে পৌছাবার আগে বা পৌছে গিয়েই বাপের সাথে জমিতে নেমে পড়ত পাকাপাকি। মেয়েদের বেলায় তাড়াহুড়ো বিয়ের ব্যবস্থা।

এ দৃশ্য সময়ের সাথে নিজের গ্রাম ছেড়ে পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলোতেও দেখতে শিখলুম। বুঝতে শিখলুম, সব গ্রামেরই মুসলিম সামাজিক চিত্রটি এক। এরা জীবন বলতে একপাল পুঁজিসহ সংসার, জোত জমি পুকুর, আর অল্প কিছু ধর্মকর্মের ঠাটবাট বোঝে। এরা পুত্র বলতে চাষবাসের হালধরা একজন এবং কন্যা বলতে কুটুম বাড়ানোর উপায় বলে মানে। আর দেখলুম, সারাদিনের অবসরটুকু এরা কোনো একটা গাছতলায় জমায়েত হয়ে গর্ভশূন্য আড্ডা আর পরচর্চার উন্মাদ আনন্দে ভরিয়ে তুলছে। তখনও আমি তার অংশীদার হয়ে ভাবতে পেরেছি, এই হল জীবনের পূর্ণতা। এখানেই মৃত্যুর চরম ঘোষণা এলে আর কিছু চাইবার থাকে না।

শের ক বছরে দিন হঠাৎ দ্রুত বদলানো শুরু। সংসারে বহু বিভাজন আসতে-আসতে জমিতে টানাহেঁচড়া লেগেছে ইতিমধ্যে। পণ্য বাজারের সাথে সংগতি হারিয়ে দেখা দিয়েছে নিদারুণ দুঃসময়। ধানের গোলা এখন আর ভরাট হয় না। দিনকাল আবহাওয়া কেমন অন্যরকম, উদ্‌বৃত্তের বদলে এখন শুধুই ঘাটতি আসে। হিসাবে কেমন গরমিল সারাক্ষণ। ক্রমশ দেখা গেল, অবসরের গাছতলা পাতলা হতে-হতে একসময় উধাও। চিরাচরিত পদ্ধতি ভেঙে চাষের ওপর নিতানতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষা। মাথায় এবন নতুন ভাবনার বোঝা চাপল। কৃষিনির্ভর মনস্তত্ত্বে ক্ষয় লাগলো একটু-একটু করে। অচিরেই স্কুলের দরজায় বাড়তি কিছু ছেলেমেয়ের আগমন ঘটল। এদের প্রায় সবটাই অক্ষরজ্ঞানবিহীন বা স্বল্পাক্ষর সংসার থেকে এসেছে। এরা এবার হাইস্কুল চিনল। তিন-চার বছর অন্তর একেক-জন কলেজও। এবং এই সময়েই গ্রামের বাইরে পড়া-লেখার কারণে পা রাখল কিছু মেয়ে। কদাচিৎ কেউ-কেউ বাসে চড়ল, ট্রেনে চড়ল, বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ডিগ্রি নেবার উৎসাহ পেল।

এসব অতি-দ্রুত-ঘটে-যাওয়া অতি সাম্প্রতিক সময়ের তথ্য। ভেতর থেকে ভাবতে গিয়েই দেখেছি, প্রধানত দুটো কারণেই এই মিউটেশন। দু-কলম ইংরাজি-বিজ্ঞান শিখতে পারলে ছেলের একটা চাকরি মিলবে, হঠাৎ ভাঁটায় একটু জোয়ার আসবে, পুরানো চরের চাষবাস ঝেড়ে ফেলাও সম্ভব হবে। অর্থাৎ দিনবদলের সাথে খাপ-খাওয়া সহজ হয়ে আসতে পারে এভাবেই। আবার, মেয়ে যদি লেখাপড়া-জানা হয়, চাকুরে একটা জামাই জুটতে পারে। নিদেন পক্ষে ভালো একটা ঘর-বর, কম খরচে বিয়ে এবং পাত্র-পক্ষের খুঁতখুঁতির আশ্চর্য পরিবর্তন তো আছেই। কিন্তু বাসনা বাসনাই রয়ে গেল। পাতা উলটেই সবাই দেখলেন, বিদ্যাশিক্ষার ব্যয়ভার মন্দ নয়, মাঝারি শেখায় চাকরি মেলানো বেশ কঠিন, এবং এমতাবস্থায় বেশ কটা বছর অথথা মাঠে মারা যায়। অন্য দিকে স্কুল-কলেজ-ফিরতি মেয়ের বিয়ে অনেক বেশি ঝামেলার। বর যদি বা মিলল, বদনামের অন্ত নেই। সম্বন্ধ ভাঙে, নিন্দা রটে, মেয়ের বাপ নাজেহাল হয়ে পড়েন।

কিন্তু কথা এখানেই ফুরোল না। একদিকে কর্তাপক্ষের হতাশার ছবি, অন্যদিকে বৃহত্তর নতুন জগৎ সজচনা একদল তরুণ। এঁরা বললেন, কাজেই যদি না এল তো প্রয়োজন কি ওসবের? ওঁরা বললেন, ওখানে একটা অন্য পৃথিবী, অন্য স্বাদ, অন্য জীবন, অনেক বৈচিত্র্য। তাকে সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে এখানে আর স্থাণুবৎ থাকা চলে না। অবশেষে দুপক্ষের মধ্যস্থতা হল এইরকম, ওই অন্য পৃথিবীতে কিছুকাল কাটিয়ে, চোখের অন্ধত্ব মুছে আগের পৃথিবীতেই ফিরে আসা ভালো।

গ্রামের মঞ্চে এ বিবর্তন শুরু হয়েছে অনেক আগে। তার অনেকটাই প্রকটভাবে দৃশ্যমান হল শেষের দুই দশকে। যুক্তি তখন দোদুল্যমান। লেখাপড়ায় তেমন কাজ কিছু নেই কিংবা যথেষ্ট আছে—এই সংঘাতের মধ্যেই একটা সময়ে দল দাঁড়াল তিন-টিতে। একদল বলছেন, চাষার ছেলের চাষেই ভাত। ভড়ং করে যতই বাবু হও, ফয়দা হবে না। আরেক দল বলছেন, শুধু লাঙল ঠেলে দিনগুজ-

রানির দিন আর নেই। যা হোক একটা চাকরি, না হলে বিঘে ফলিয়ে একালের চাষবাসেও উন্নতি করা যায়। মেয়েসন্তানও পাড়ায়-পাড়ায় হল্লা না মেরে পড়াপড়িতেই ঘরে বন্দী হোক্। বাইরের এটা ওটা শিখে এসে ঘরে তৈরি করুক। এতেই অনেক। শেষ দল বলছেন, শিক্ষা ছড়িয়ে পড়ুক, আমরাও তা চাই। স্বয় আল্লা নবী চেয়েছেন। তবে সে হিন্দুয়ানি শিক্ষা নয়। 'পৃথিবী ঘোরে' শিক্ষা নয়। সে শিক্ষা হল ইসলামী শিক্ষা, দ্বীনিয়াতের শিক্ষা। পুরুষকে যা প্রভুর প্রতি বাধ্য করে, অবনত করে। নারীকে যা পরদা শেখায়, চলায় বলায় হোক না হোক, পাপ-পুণ্য, স্বামী-অধীনতা শেখায়। সে শিক্ষা ঈমানের কথা বলে। তিন ভাবনায় প্রতিষ্ঠিত হল এবার। প্রচ্ছন্ন সংঘাত ঠিকই রইল; তবে কেন্দ্র-বিন্দুতে সবাই 'খাঁটি মুসলমান' থাকতেই চাইলেন।

পরবর্তী কালে ফল দাঁড়াল (১) স্কুল-কলেজে ইতিহাস বিজ্ঞান ইংরাজি দর্শন পড়ে এসেছেন যাঁরা, তাঁরা পড়লেন সংশয়ে। বিশ্বাস আর যুক্তিতে বাঁধল দ্বন্দ্ব। কোনোটাকেই এঁরা পুরোপুরি ত্যাগ করতে না পেরে এক-বার যুক্তি মানছেন, একবার বিশ্বাস। ফলত যা কিছু দেখছেন ভাবছেন সবই বাইরের চোখে। জন্ম নিচ্ছে ভিত্তিহীন ভাবপ্রবণতা। (২) দৃঢ়ভাবে ইসলামি শিক্ষা যাঁরা আঁকড়ে রইলেন, তাঁরা বিশ্বাস থেকে একচুল সরতেও চাইলেন না। এতকাল যেমন চলেছে, এতকাল তফকে যেমন বিশ্লেষণ করা হয়েছে—তেমনই চলছে এবং চলবে—এই তাঁদের অভিমত। যুগ বদলালে, পরি-স্থিতি বদলালেও তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা আর রীতিপদ্ধতি মচকাবে না কিছুতেই—এই সিদ্ধান্তে তাঁরা স্থির। (৩) বাকি রইলেন যে বিশেষ শ্রেণী, এঁরা ভাগ-মান। যিনি বেশি গাইতে পারেন, এখানে তাঁরই জয়ধ্বনি। আবার সংখ্যায় যেহেতু এঁরা অধিক, এঁদের পক্ষে আনার চেষ্টা শুরু হল নানা-ভাবে। যা কিছু বলার কথা। এঁদের দিয়েই বলাতে চাইলেন অপরাপর দু-পক্ষই। উদ্ভব হল প্রকাশ্য সংঘাতের।

এ দৃশ্য আমরা ইতিপূর্বে বহুবার দেখেছি। তখনো যুক্তির জোয়ার এমন ভাবে আসে নি। তখনো দ্বন্দ্ব ছিল হিন্দু-মুসলিমের ভাবনা-বিশ্বাসে; মুস-লিম মুসলিমের মৌলিকতায় নয়। এ শতকের গোড়ার ইতিহাসেও সেই ইঙ্গিত স্পষ্ট। ব্যক্তিক্রান্ত কোনো মানুষই সেদিন অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠায় সফল হতে সক্ষম হন নি। তারপর জল গড়িয়ে গেল অনেক দূর। তেল-জল মিলেমিশে ঘোলাটে হবার ভয়ে পৃথক পাত্র নিল। আমরা অবশিষ্টরা পার্থক্য আনতে না পেরে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান-কেই মনেপ্রাণে মেনে নিলুম। দিন সেখানেই থেমে থাকবার কথা নয়, থাকেও নি। আজকের অবস্থার দিকে তাকালে আগামী দিনের স্বতঃ এক ইতিহাস দেখতে ব্যর্থ হব না আমরা। যেখানে ঘরে-বাইরে আজকের খোঁড়া বাদশাদের মুর্খ আস্ফালন।

অনেক পেছন থেকে অনেক এগিয়ে গেছি। তিনের মধ্যে যে প্রথম শ্রেণীর উল্লেখ করেছি ক্ষণপূর্বে, এই মুহূর্তে তাঁদের বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে দুভাবে চিহ্নিত করা যায়। আমরা দেখলুম, আধুনিক শিক্ষার কারণে যাঁরা যুক্তি-বিশ্বাসের দ্বন্দ্বে পড়েছেন, তাঁদের একটা উপদল ছিটকে এল যুক্তির ঘরে। অন্যেরা 'ন যযৌ, ন তস্থৌ'। তাঁরা মুক্তদৃষ্টিও ইতিমধ্যে কিছুটা পেয়েছেন। অথচ তাঁরা এ সমাজের অচলগতি দেখতে পাচ্ছেন। তাঁরা অর্থনীতি ধর্মনীতিকে উহ্য রেখে এ সমাজের অনগ্রসর শিক্ষা, রুগ্ন অর্থনীতি ইত্যাদি সব বিষয়কেই একটু-আধটু বুঝতে পারছেন। বলতে পারছেন, চিরটা কাল তো আমরা এইরকমই ছিলাম না! কার কারণে তবে এমন ভাঙনবেলা এল? এ প্রশ্ন নিশ্চয়ই সমাজ-চেতনার ফল; মনে তেমনই আশা সঞ্চার করে। কিন্তু হায়! কারণ দেখতে গিয়েই এঁরা বললেন, সবই আসলে ষড়যন্ত্র। এই যে আমরা বিষ হারিয়ে ঢোঁড়া হতে বসেছি, এই যে আমরা ক্রমাগত প্রহৃত হচ্ছি, এই যে আমরা ধুঁকতে-ধুঁকতে ধ্বংসের দিকে চলেছি—সবই হিন্দুর চক্রান্ত। ওরা নিজের জন্যে প্রাসাদ বানিয়ে আমাদের দেবে গাছতলা। নয়তো ওদের পাশে দাঁড়াতে কেন পারছি নে? এরা ঘর ভেঙেছে দেখলেন, ঝড়কে দোষ দিলেন। অথচ চালে দেয়ালে ঘুন-ফাটল বহুদিনের, সে কথা একটুও জানতে চাইলেন না। বললেন না, এ ভিটেতেই এখন নতুন বাড়ি তুলতে হবে।

যাঁরা আশ্রয় নিলেন যুক্তিভাবনায়, তাঁরাও সমস্ত অধোগতি, দুরবস্থা দেখ-লেন। পরিস্থিতির গভীরে গিয়ে দেখে-শুনে বললেন, আমরা ধ্বংসের দিকে চলেছি একথা খুবই সত্যি। তবে তা কারো ষড়যন্ত্র নয়। যুগবিবর্তনের সঙ্গে সংগতি না রেখে আমরা অনেক পুরানো সময়ে, পুরানো বিশ্বাসে, পুরানো ভাবনায় থেমে আছি বলেই আজকের প্রতিযোগিতায় আমাদের

স্থান নেই। বিশ্বাস, স্বাজাত্যাভিমান, ভ্রান্ত স্বখের বৃ্যহ ভেঙে না উঠতে পারলে আজ আর এগিয়ে আসা সম্ভব হবে না। এই হচ্ছে আসল কথা। আসল কথা, আমাদের পুরোপুরি একালের মানুষ, একালের মুসলমান হওয়া দরকার।

মাদ্রাসাপন্থী দল এ যুক্তি মানলেন না। মানলেন না মুসলমান চিন্তার আধুনিকীকরণ। ভাসমান দলকে তাঁরা পরকাল দেখিয়ে ইহকাল কব্জা করলেন। অবশেষে যুক্ত হলেন হিন্দুদোষা উপ-দলের সারিতে। মুষ্টিমেয় অবশিষ্টদের আক্রমণ করে বললেন, তোমরা হচ্ছ হিন্দুয়ানি মুসলমান, হিন্দুর 'চামচা'। তোমরা হচ্ছ ইসলামের, মুসলমানের পয়লা নম্বরের শত্রু। ফেরেব্বাজ, মোনাফেক। সমাজটাকে বিকিয়ে দেওয়ার ইচ্ছে তোমাদের। ধর্মকে ভাসিয়ে দিতে তোমাদের সুখ। এই তো তোমাদের আধুনিক শিক্ষা, আধুনিক চিন্তা, আধুনিক মানুষ হবার কল। কাফের! কাফের!

বলতে দ্বিধা নেই, একটা সময়ে ওই বিরাট দলের হয়ে ওইসব বলতে আমারও ভালো লাগত। চোখে মুখে দৃঢ় প্রত্যয় পেতুম। প্রতিনিয়ত আমার এই বহুচেনা সমাজ থেকে পশুত্বের অহংকার তুলতে-তুলতে একদিন নিজের কাছেই থমকে গিয়ে দেখলুম, আমি ক্ষয়ে যাচ্ছি, হারিয়ে যাচ্ছি। বাইরের বাতাসে আমি বুক ভরে শ্বাস নিতে চাইলুম। এবং তখনই নজরে এল, আমি কখন 'চামচা' হয়ে পড়েছি। আমার মুসলমানত্ব 'সন্দেহের বিষয়' হয়ে পড়ছে। আমি কতিপয়-এর দলভুক্ত হয়েছি। সেইখানে দাঁড়িয়ে আর-একটা দৃশ্য আমার চোখে পড়ল প্রকটভাবে। মাদ্রাসাপন্থী যে দল যাঁরা শরীয়ত নিয়ে সর্বক্ষণ বক্তৃতা করেন, তাঁরা প্রতিনিয়ত এক অন্তর্দ্বন্দ্ব চালিয়ে যাচ্ছেন। সে দ্বন্দ্ব তাঁদের স্বদলে, শরীয়তের খুঁটিনাটি ব্যাখ্যা নিয়ে। তাঁরা প্রত্যেকে একে অন্যের ধর্মীয় রীতিপদ্ধতির বিষয়ে আক্রমণ করতে-করতে পৃথক-পৃথক গোষ্ঠী রচনায় ব্যস্ত। এবং সেক্ষেত্রেও কে প্রকৃত মুসলমান—এই বিতর্ক উঠছে সর্বত্র।

এ হল অতি চাঞ্চল্যকর এই মুহূর্তের কথা। '৮৫-র আন্দোলিত ঘটনার মধ্যবর্তী সমাজে কতিপয় যুক্তি-বাদীর দলে উত্তরোত্তর সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটতে দেখলুম। যুবগোষ্ঠীর বহুলাংশ স্ব-উৎসাহে এখানে এসে বললেন, খোলা ঘরও বন্ধ হয়ে উঠেছে, আমরা হাঁপিয়ে উঠেছি। এখন আলো চাই, মুক্ত বাতায়ন চাই। এঁরা সবাই যুক্তি-নির্ভর হতে চাইছেন। আত্মশুদ্ধির প্রয়োজনের কথা বলছেন। অন্য দলের চাপে আর কোণঠাসা হয়ে পড়ছেন না। আরও দেখা গেল, গৃহকোণের নারীও এই প্রথম সামান্য হলেও নতুন বিষয়ের ভাবনা পাচ্ছেন। ভাষা পাচ্ছেন। তাঁরাও এই যুগচেতনার শরিক হতে চাইছেন। বলছেন, আমরাও এবার দাঁড়িয়ে উঠতে চাই, জীবনকে চিনতে চাই। স্বয়ং আল্লা আমাদের এ অধিকার, এ মর্যাদা দিয়ে-ছেন। স্বভাবতই বলা যায়, অদূর আগামীতে আমরা গ্রাম্য মুসলিম নারীর বিবর্তনের ক্রমপর্যায়ও স্পষ্টভাবে লক্ষ করতে পারব।

রফিউদ্দিন

রসই। দ. চাতরা। উ. ২৪ পরগণা

প্রসঙ্গ : পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি

১৯৮৫ সালে কথা দেওয়া হয়েছিল এক বছরের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে বাংলা আকাদেমি স্থাপন করা হবে। সে কথা রাখা হয়েছে। "বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশসাধন এবং তার ঐতিহ্যরক্ষার বিভিন্ন দিকে সবরকম দায়িত্ব পালন"-এর উদ্দেশ্য নিয়ে ২০ মে ১৯৮৬ আনুষ্ঠানিকভাবে 'পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি'র উদ্‌বোধন হল।

এই এক বছরে রাজ্য সরকার আরও কিছু দরকারি কাজ করেছেন। বাঙলা ভাষা প্রসঙ্গে পাঁচটি বিষয় নিয়ে গত বছর মে মাসে যে আলোচনা-চক্রের আয়োজন করা হয়েছিল, তার পর চারটি বিষয়ে চারটি উপসমিতি গঠন করা হয়। উদ্দেশ্য : লিখিত আর কথিত যেসব অভিমত, প্রস্তাব ইত্যাদি সেই সেমিনারে উপস্থাপিত হয়েছিল, সেগুলির বিচারবিশ্লেষণ, এবং প্রাথ-মিকভাবে কিছু-কিছু প্রস্তাব গ্রহণ।

উপসমিতি চারটি তাঁদের দায়িত্ব কতকটা পালন করেছেন—সংস্কারের মূলনীতিগুলি অন্তত নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

অভিধান, কোষগ্রন্থ এবং পরিভাষা সম্বন্ধে যেসব সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে সেগুলির রূপায়ন অনেক চিন্তা- আর সময়-সাপেক্ষ যৌথ কাজ। কিন্তু সত্যি-সত্যি আন্তরিকতা থাকলে, লিপিসংস্কার আর বানানসংস্কার সম্বন্ধে গৃহীত প্রস্তাবগুলিকে কতকটা দ্রুত কার্যকর করা যায়।

এক। রাজ্য সরকারের প্রাথমিক-শিক্ষামন্ত্রক যদি যথার্থভাবে উদ্যোগী হন তাহলে লিপিসংস্কারের সুপারিশ-গুলিকে এখনই অনেকাংশে বাস্তব করে তোলা সম্ভব।

সেক্ষেত্রে তাঁদের স্থির সিদ্ধান্ত নিতে হয় যে, ১৯৮৭ আর ১৯৮৮ সালের শিক্ষাবর্ষের শুরুতেই অন্তত প্রথম, দ্বিতীয় আর তৃতীয় শ্রেণীর সব-কখানি বই ফোটোটাইপসেটিঙ পদ্ধতিতে কমপোজ করিয়ে প্রকাশ করবেন (হাতে-গাঁথা কমপোজে একে-বারেই যাবেন না)। আর, ১৯৮৯ সালের শিক্ষাবর্ষে সরকারপ্রকাশিত প্রাথমিক পর্যায়ের প্রত্যেকটি বই পিটিএস পদ্ধতিতে ছাপা হবে।

এ কাজ সম্ভব করে তুলতে হলে সরকারি দপ্তরের রীতিনীতি হয়তো কিছুটা শিথিল করতে হবে—সর্বনিম্ন টেনডারে কাজ করানোর নিয়ম হয়তো ভাঙতে হবে। প্রাথমিকশিক্ষামন্ত্রক বাঙলা ভাষার বিকাশের স্বার্থে তা করবেন কিনা বলা যায় না। যদি করেন, লিপিসংস্কারের ভিত শক্ত জমির উপর গাঁথা হয়ে যাবে।

দুই। বানানসংস্কার উপসমিতি বাঙলা ভাষার শব্দগুলিকে তৎসম, অর্ধতৎসম, তদ্ভব, বিদেশী—এই চার ভাগে ভাগ করে মোট ২৬টি নিয়মের প্রস্তাব দিয়েছেন। ('দেশজ' নাম দিয়ে কোনো বিভাগ দেখান নি।) <ঠোঙা, ডিঙি, থাড়ু,>ধ্বন্যাত্মক শব্দ —এসব তাহলে কোন্ ভাগে পড়বে?

বানানের ক্ষেত্রে দু-তিনটি প্রশ্ন তোলার অবকাশ আছে।

১৯৩৬-এ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বানান সংস্কার সমিতি মূলত তৎসম শব্দের সংস্কার করেন নি। যা তাঁরা করেছিলেন তাকে বলা যায় সরলীকরণ, সংস্কৃত ব্যাকরণের গণ্ডির মধ্যে থেকেই দু-একটি ক্ষেত্রে সরল রূপটিকে গ্রহণের বিধান দিয়েছিলেন তাঁরা।

আগে সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম মেনেই লেখা হত <কর্ত্তব্য, সঙ্গীত> ইত্যাদি। তাঁরা যখন <কর্তব্য, সংগীত> লিখতে বললেন, তখনও ব্যাকরণসিদ্ধ বিধানই দেওয়া হয়েছিল। ১৯৮৫-র এই উপসমিতি সংস্কৃত ব্যাক-রণের নিয়ম লঙ্ঘন করতে চাইছেন। এঁরা বলছেন, <শশীভূষণ, প্রতি-যোগীতা> বানান চলবে : "ইন্ প্রত্যয়ান্ত শব্দ সমাসবদ্ধ হলে হ্রস্ব-ইকার নিষ্প্রয়োজন।"

ভালো। তাহলে বিন্-প্রত্যয়ান্ত শব্দেও এই বিধান অনুসরণ করে লেখা যায় <মনস্বীতা, তেজস্বীতা, মেধা-বীনী, তপস্বীনী, স্রোতস্বীনী>। উপসমিতি এসব বানান মানবেন তো?

আরও কথা আছে। (ক) মাধ্য-মিক স্তরে সংস্কৃত এখনও তুলে দেওয়া হয় নি—সিলেবাস একটু হালকা করে দেওয়া হয়েছে মাত্র। সংস্কৃত পড়ানোর সময় কী বানান শেখানো হবে এইসব শব্দের? সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রী বাঙলা বইয়ে পড়বে <উপকারীতা>, আর সংস্কৃত বইয়ে পড়বে <উপ-কারিতা>? উপসমিতি সত্যিই কি

তাই চান? (খ) যাঁরা সংস্কৃতব্যাকরণ-নির্দিষ্ট বানান <সহযোগিতা, সহধর্মিণী> লিখে গেছেন, তাঁদের রচনা পুনর্মুদ্রণের সময় কী করা হবে—<সহযোগীতা, সহধর্মীণী> লেখা হবে কি? (গ) হিন্দি, মারাঠি, গুজরাতি, ওড়িয়া, অসমীয়া ইত্যাদি ভাষায় এই সংস্কার যদি মানা না হয়? এইসব ভাষা থেকে বাঙলায় উদ্ধৃতি দেবার সময় কোন্ বানান চলবে? (ঘ) উপসমিতির প্রথম বিধানে বলা হয়েছে, <তরণি, ধরণি, অবনি, বেণি, শ্রেণি> ইত্যাদি না লিখে <তরণী, ধরণী, অবনী, বেণী, শ্রেণী> লেখা উচিত। কেননা দ্বিতীয় গুচ্ছের বানানগুলি 'অধিকতর প্রচলিত'। এই যুক্তি ধরেই প্রশ্ন ওঠে: <অপকারিতা, উপযোগিতা, পক্ষিশাবক, হস্তিযূথ> ইত্যাদি বানান কি একান্তই অপ্রচলিত? উপসমিতিবিহিত বানানই কি অধিকতর প্রচলিত?

এই নিয়মকে যদি ছাড়পত্র দেওয়া হয়, এর পিঠে-পিঠে তখন আসবে <মনযোগ, সদ্যজাত> ইত্যাদি। রবীন্দ্রনাথের গান লেখা হবে <কত যে তুমি মনহর মনই তাহা জানে>। উপসমিতি এইসব বানানকে তখন বাধা দেবেন না তো? (আজগুবি কথা নয়, এইসব প্রস্তাব কানে আসে।)

এইসব ঝনঝাট সহজেই এড়ানো যায় যদি সংস্কৃত শব্দকে বাঙলায় প্রাতিপদিক বলে গ্রহণ করি (সংস্কৃতে সেসব সাধিত শব্দ হলেও)। এইসব বানানের অসংগতি নিয়ে ছাত্রছাত্রী প্রশ্ন করলে উত্তর দেওয়া যাবে—এগুলি সংস্কৃত শব্দ বাঙলায় ওই বানান নিয়েই এনেছে।

তিন। তদ্ভব শব্দ নিয়েও কিছু প্রশ্ন আছে। বলা হয়েছে, "জাতিবাচক ও ভাষাবাচক শব্দে হ্রস্ব-ইকার হবে, যেমন জাপানি, বাঙালি, ফরাসি, আরবি।" অর্থাৎ, এখানে প্রত্যয়টি 'ই'। আরও বলা হয়েছে, "সাধারণ বিশেষ্য পদে হ্রস্ব স্বরচিহ্নই একমাত্র গ্রাহ্য হবে।"—ওকালতি, জমিদারি, তেজারতি। কিন্তু এই শব্দগুলিই যখন বিশেষণ হিসেবে আসবে, তখন বানান কী হবে? <জমিদারী> আয়, না, <জমিদারি> আয়? <তেজারতী> কারবার, না, <তেজারতি> কারবার? কাবিন <সোনালী>, না <সোনালি>? তবক <রুপোলী> না, <রুপোলি>? < ছোট্ট মেয়ে রোদ্দুরে দেয়রেগানি রঙের শাড়ি?—বেগনী হবে কি? পদ্মার মাঝির মুখে শুনেছি <বরালি দিন>—বরালী হবে কি? <কাঁসারি, ভিখারি, জুয়াড়ি,শাঁখারি>, না, <কাঁসারী, ভিখারী, জুয়াড়ী, শাঁখারী>? অর্থাৎ, বিশেষণপদ তৈরি করতে গিয়ে যে<ই, আরি, আলি>প্রত্যয় যোগ করি, তা কি ঈ-কারান্ত?

এই প্রশ্নের সদুত্তর প্রয়োজন।

চার। বলা হয়েছে, <সিট,গ্রিন, ক্রিম> লেখা উচিত।

এখানেও প্রশ্ন আছে। মাধ্যমিক স্তর থেকে ইংরেজি পড়ানো হচ্ছে। ইংরেজির ক্লাসে কি শব্দের সঠিক ইংরেজি উচ্চারণ শেখানো হবে না? ছেলেমেয়েরা কি <cheap, neat, peak> ইত্যাদি শব্দের উচ্চারণ করবে [চিপ, নিট, পিক]? যদি সঠিক উচ্চারণ শেখাতে হবে বলে মনে করা হয়, তাহলে এসব শব্দের বাঙলা প্রতিবর্ণীকরণ কি ধ্বনিসম্মত হওয়া উচিত নয়? বলতে বলব <পীক>, লিখতে বলব <পিক>?

বিদেশী ব্যক্তিনাম, বস্তুনাম, স্থাননাম আমরা বঙ্গলিপিতে লিখে থাকি। কখনও-কখনও বিদেশী ভাষার বাক্য বা বাক্যাংশ বঙ্গলিপিতে লেখার দরকার হতে পারে। তখন কী করা হবে? উচ্চারণে যেখানে ঈ বা ঊ আছে, লেখায় সেখানে ই বা উ থাকবে?

আশা করা যায়, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি অগোণে বানানের এসব সমস্যার সমাধানে তৎপর হবেন।

অশোক ঘোষ
কলকাতা

কোণঠাসা শিক্ষাব্যবস্থা

যে-কোন কাজ করতে গেলেই একটু নড়াচড়া করবার, কিংবা অন্তত একটু হাত-পা নাড়বার মতো জায়গা দরকার হয়। আমাদের সমস্ত শিক্ষাব্যবস্থাটা এখন এমনভাবে কোণঠাসা হয়ে পড়েছে যে তার কাছ থেকে নতুন কোনো পদক্ষেপ, নিজের দোষ-ত্রুটি সংশোধনের নতুন কোনো উদ্যম, মনে হয় যেন অসম্ভব আশা। অথচ শিক্ষা নিয়ে দুশ্চিন্তার অন্ত নেই, বাদানুবাদের বিরতি নেই, ঠিকমতো শিক্ষা ঠিকমতো জায়গায় পৌঁছচ্ছে না, যেটুকু পৌঁছচ্ছে তাও ঠিকমতো কাজে লাগছে না, দেশবাসী বঞ্চিত হচ্ছে শিক্ষা না পেয়ে, দেশ বঞ্চিত হচ্ছে শিক্ষিত দেশবাসীর সেবা না পেয়ে। কাজেই, কিছু একটা এখনই করা দরকার, আর দেরি নয় না।

দেরি তো নয় না, কিন্তু অবকাশ কোথায় কিছু করবার? বিপুলসংখ্যক বালক-বালিকাকে, তরুণ-তরুণীকে যা-হোক একটু লেখাপড়া শিখিয়ে দেওয়ার, তাদের যা-হোক একটা পরীক্ষা নেওয়ার, যা-হোক একটা সার্টিফিকেট কিংবা ডিগ্রি হাতে ধরিয়ে দেওয়ার, এবং যা-হোক করে ইস্কুল কলেজ ইত্যাদির চৌকাঠটা পার করে দেওয়ার যে ব্যবস্থাটা চলছে, তাকে যা-হোক করে চালু রাখতেই হবে। এর সামান্য একটু নড়চড় হলেই, কী যে কাণ্ড বাধবে, আমাদের কল্পনা করতেই ভয় হয়।

এই 'যা-হোক' শিক্ষার যাত্রাপথের বাইরে যেসব পেশাগত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, কিংবা শিক্ষাব্যবস্থা, কিংবা তার ভিতরে থেকেও যেসব ইস্কুল-কলেজ নিজের-নিজের প্রচেষ্টায় এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে, বিশেষ-বিশেষ অধিকার এবং ক্ষমতার বলে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য এবং গুণগত মান বজায় রাখতে পেরেছে, তাদের কথা আলাদা। তারা, দরকার মনে করলে, শিক্ষার এবং পরীক্ষার মান উন্নত করতে পারে এবং সে মান যাতে বজায় রাখা সম্ভব হয় সেজন্যে প্রবেশদ্বারেই কড়া পরীক্ষার ব্যবস্থা করতে পারে। তাতে দেশে কোনো আলোড়ন ওঠে না। সবাই জানে, এবং মেনে নেয়, অমুক লাইন, কি অমুক প্রতিষ্ঠান সাধারণ ছেলে-মেয়েদের জন্যে নয়, সেখানে ঢুকতে গেলে পেটে বিদ্যে চাই। তেমনি আবার সেখান থেকে যারা বেরিয়ে আসে, তাদেরও শিক্ষাদীক্ষা সমীহ করবার মতো। ভালো ছাত্র না ঢুকলে ভালো ডাক্তার, কি ইঞ্জিনিয়ার, কি বিজ্ঞানী বেরোবে কী করে? ইংরেজিতে বলে, শুয়োরের কান দিয়ে সিলকের মানিব্যাগ তৈরি করা যায় না।

এইসব বিশেষ ব্যবস্থা বিশেষ ছাত্রছাত্রীদের জন্যে, যারা শীর্ষস্থানীয়, এলিট। সামাজিক এলিট নয়, মেধার জগতে এলিট, কিংবা অন্তত পরীক্ষার জগতে এলিট। (এ দুটো জগৎ সব সময়ে এক নাও হতে পারে।) নতুন শিক্ষাপরিকল্পনায় যে "নবোদয়" বিদ্যালয়ের কথা শোনা যাচ্ছে, কোনো সন্দেহ নেই, তা এই এলিটের জন্যে। কিন্তু তাই বলে এ নিয়ে যাঁরা আপত্তি করছেন তাঁদের যুক্তিটা বোঝা কঠিন। শীর্ষস্থানীয়, কিংবা উচ্চবর্গীয়দের জন্যে আলাদা ব্যবস্থা যখন আমরা বড়ো-বড়ো শহরে বরদাস্ত করতে পারছি, যখন আমরা মেনে নিয়েছি, অমুক ইস্কুলে, অমুক কলেজে ঢুকতে গেলে কঠিন প্রতিযোগিতায় জিততে হবে, অমুক কলেজে অমুক বিষয়ে অনার্সের ক্লাসে ভরতি হতে গেলে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় অন্ত নম্বরের কম পেলে চলবে না, তখন সেসব শিক্ষাক্ষেত্রে কারা আমন্ত্রিত, কারা নয়, সে বিষয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ কি থাকে!

অবশ্য এতেও কোনো সন্দেহ নেই, শিক্ষাগত শ্রেণীবিন্যাসে যারা উচ্চবর্গীয় তাদের মধ্যে, অধিকাংশ না হলেও, অনেকেই সামাজিক তথা অর্থনৈতিক শ্রেণীবিন্যাসেও উচ্চতর বর্গের অন্তর্গত। এই সত্যেরই উলটো পিঠে আরেকটি দুঃখদায়ক সত্য: সামাজিক-অর্থনৈতিক শ্রেণীবিন্যাসে যাদের অবস্থান নীচের দিকে, তাদের মধ্যে থেকে উঠে এসে উচ্চবর্গীয় শিক্ষায় প্রবেশের প্রতিযোগিতায় জয়লাভের সম্ভাবনা অপেক্ষাকৃত কম।

তবু, এত সব জেনেও, অল্পসংখ্যকের সুশিক্ষার জন্যে স্বতন্ত্র ব্যবস্থার প্রয়োজন আমরা অস্বীকার করি নি। তাহলে "নবোদয়"-এর

দেশে বিদেশে

পরিকল্পনাই বা আমাদের সমাজতান্ত্রিক বিবেককে এত পীড়া দিচ্ছে কেন? বড়ো-বড়ো শহরের বাইরে, যেসব জায়গায় ছেলেমেয়েদের পক্ষে বড়ো-বড়ো শহরে থেকে ভালো-ভালো ইস্কুলে পড়াশোনা করা কঠিন, এমন-কি অনেকের পক্ষে অসাধ্যও বটে, সেখানে যদি অল্প খরচে, কিংবা বিনা খরচে, একটু উচ্চমানের শিক্ষার সুযোগ করে দেওয়া যায়, তাতে, আমরা যারা শহরে থাকি, তাদের আপত্তি করার রাজনৈতিক কারণ থাকতে পারে, শিক্ষাগত এবং সামাজিক কোনো কারণ খুঁজে পাওয়া মুশকিল।

যার যোগ্যতা আছে, ক্ষমতা আছে, এবং সত্যিকারের প্রয়োজন আছে তার জন্যে গ্রামাঞ্চলেও শহরের মতো, উচ্চতর মানের বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হোক; সরকারি হাসপাতালের পাশাপাশি নার্সিং হোমের সেবা যে সমাজ নির্বিবাদে হাত পেতে নিতে পারে, সাধারণ বিদ্যালয়ের পাশাপাশি নবোদয় বিদ্যালয়ের আভিজাত্যের ছোঁয়া লেগে তার জাত যাওয়া উচিত নয়। একটাই আপত্তি উঠতে পারে—সরকারি খরচে কেন সে আভিজাত্যের আসন পাতা হবে? বরং সেই টাকা বাঁচিয়ে সাধারণ সরকারি এবং বেসরকারি বিদ্যালয়ের মান উন্নত করা যেত।

আর কেউ না মানুক, একজন সমাজতন্ত্রবাদী নিশ্চয় মানবেন, সামাজিক প্রয়োজনবোধে, সমাজের বিশেষ অংশের চাহিদা মেটাবার জন্যে রাষ্ট্রীয় সম্পদের বিনিয়োগ কাম্য, বিশেষত যদি সে চাহিদা মেটাতে বেসরকারি উদ্যোগ এগিয়ে না আসে। আর, সেই টাকাই যদি গ্রাম-গঞ্জে, মফসল শহরে সরকারি বেসরকারি ইস্কুলের পিছনে ঢালা হয়, তাতে সেসব প্রতিষ্ঠান যে সেই অনুপাতে উন্নত হয়ে উঠবে, সে নিশ্চয়তার অভাব আশা করি সকলেই স্বীকার করবেন। (অবশ্য যে-কোনো বিদ্যালয়েরই যা-যা ন্যূনতম প্রয়োজন তা মেটাতেই হবে। যে ইস্কুলে ব্ল্যাকবোর্ড নেই, সেখানে ব্ল্যাকবোর্ড পৌঁছে দিতেই হবে। কিন্তু সে দায় সরকারি শিক্ষাদপ্তরের সাধারণ দায়। সে দায় বহন করবার শক্তি যদি সরকারের না থাকে, সে কথা তাঁদের খোলাখুলি স্বীকার করাই ভালো।)

তার চেয়ে বড়ো যেটা ভাববার কথা, সেটা হল, আমাদের সমস্ত শিক্ষাব্যবস্থাটা যে বিপুল সামাজিক চাপের মধ্যে পড়ে সত্যিকায়ের কোনো উন্নতির পথে এক ইঞ্চি এগোবারও শক্তি প্রায় সম্পূর্ণ হারিয়েছে, তার হাত থেকে উদ্ধারের উপায় কী করা যায়? চাপটা কী-রকম, বড়ো-বড়ো শহরের ভালো-ভালো ইস্কুল-কলেজের কথাই যাঁরা মাথায় রাখেন, তাঁদের পক্ষে আন্দাজ করাও শক্ত। সারা রাজ্য জুড়ে গ্রামে-গ্রামান্তরে হাজার-হাজার ইস্কুলে পড়াশোনা চলছে, ছেলেমেয়ে ক্লাসের পর ক্লাসে উঠছে, মাধ্যমিক উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা দিচ্ছে, পাশ করছে, উচ্চতর শিক্ষায় প্রবেশ করছে, পাশ করছে। তারপর সেই "উচ্চশিক্ষিত" ব্যক্তিরা চাকরি পাচ্ছেন কিনা, কিংবা অন্য কোনো ভাবে জীবিকার সংস্থান করতে পারছেন কিনা, তাঁদের উচ্চশিক্ষা সমাজের কোনো কাজে লাগছে কিনা, এসব প্রশ্ন আলাদা। কিন্তু মোটেই "আলাদা" নয় অন্য-একটা প্রশ্ন যার ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর করছে "শিক্ষা-ব্যবস্থা"-নামক বিরাট এবং বিপুল-ব্যয়সাধ্য একটা কর্মকাণ্ডের অস্তিত্বেরই যৌক্তিকতা: গ্রামাঞ্চলের একটি সাধারণ বিদ্যালয়ের, ধরুন অষ্টম শ্রেণীর একজন ছাত্র, তার শিক্ষাটা কোন্ মানে পৌঁছনো উচিত, এবং আসলে কোন্ মানে পৌঁছেছে? ইংরেজির কথা ধরুন। তার কতটা ইংরেজি শেখা উচিত, কতটা শিখেছে? সে যখন মাধ্যমিক পরীক্ষা দিতে যায়, তখন প্রশ্ন ওঠে, মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসবার যোগ্যতা সে কি অর্জন করেছে? তারপর সে মাধ্যমিক পাশ করল। সেই-রকমই একটা প্রশ্ন কিন্তু তখনও কাঁটার মতো বিঁধতে থাকে, যদিও পরীক্ষার ফলেই সে প্রশ্নের মীমাংসা হওয়া উচিত ছিল: মাধ্যমিক পরীক্ষায় পাশ করবার জন্যে যে মান শিক্ষাবিদেরা অনেক মাথা ঘামিয়ে নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, পাশ-করা ছাত্রটি কি সে মানে পৌঁছেছিল? তারপর সে উচ্চমাধ্যমিক পাশ করল, তখনও একই প্রশ্ন। এই পরীক্ষায় কি তার পাশ করবার কথা? উচ্চশিক্ষায় যখন সেই ছাত্র প্রবেশ করল, তখন এসব প্রশ্ন প্রায় অর্থহীন হয়ে পড়েছে। অর্থহীন এই কারণে যে, কলেজে ছেলেমেয়েরা হুড়হুড় করে এক দরজা দিয়ে ঢোকে, হুড়হুড় করে আরেক দরজা দিয়ে বেরিয়ে যায়। কে কী শিখল, না শিখল, এসব কথা ভালো করে জিজ্ঞেস করবার সেখানে সময়ই পাওয়া যায় না।

অর্থাৎ, ছেলেমেয়েরা যখন শিক্ষার যে স্তরে পৌঁছেছে তখন সেই স্তরের উপযুক্ত শিক্ষা তারা নিয়ে এসেছে, উচ্চতর শিক্ষায় প্রবেশের আগে তারা মাধ্যমিক শিক্ষা প্রকৃত অর্থে সম্পূর্ণ করেছে, পর্যায়ভুক্ত শিক্ষাব্যবস্থার এই যে মৌলিক পূর্বধারণা, এটাই আজ অসম্ভব রকম অবাস্তব হয়ে দাঁড়িয়েছে। কী করে এমন হল?

কারণটা বোঝা খুবই সহজ। যতই আমরা শিক্ষা নিয়ে বৃহদাকারের চিন্তায় ব্যতিব্যস্ত থাকি, আসলে, একজন ছাত্র এবং তার শিক্ষক, এই নিয়েই শিক্ষার আসল কারবার চলে। যে শিক্ষক তাঁর ছাত্রকে তার বিশেষ স্তরের উপযোগী শিক্ষা দিতে না পারেন (যদি অবশ্য ছাত্রের তেমন যোগ্যতা থাকে এবং আগ্রহ থাকে) তিনি অযোগ্য; যে শিক্ষক অনুপযুক্ত জেনেও কোনো ছাত্রকে একটি স্তর অতিক্রম করে আরেকটি স্তরে প্রবেশের উপযুক্ত বলে ঘোষণা করেন, তিনি অসাধু। একদিকে এই অযোগ্যতা, আরেকদিকে এই অসাধুতা আমাদের সমস্ত শিক্ষা-ব্যবস্থাটাকে আজ বহুলাংশে অর্থহীন করে তুলেছে। এখন পরীক্ষাই বলুন আর পাশই বলুন, সবই মনে হয় অলীক। শুধুমাত্র মুষ্টিমেয়র কথা, যারা মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, ডিগ্রী ইত্যাদি পরীক্ষায় সাফল্যের শৃঙ্গে বিরাজ করে, তাদের কথা মনে রাখলে মনে হতে পারে, এ ধারণা অযৌক্তিক। কিন্তু রাজ্য জুড়ে হাজার-হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে লক্ষ-লক্ষ ছেলে-মেয়ে ও যারা গ্রামে-গঞ্জে, শহরে-বন্দরে, অসংখ্য দায়িত্ব পালন করবে, নিজেদের হাতে করে নির্মাণ করবে দেশের, এবং নিজেদের, ভবিষ্যৎ, তাদের কথা ভাবলে তাদের শিক্ষাদীক্ষা, তাদের পরীক্ষা এবং পাশের কথা ভাবলে, একটা অসম্ভব হতাশায় মন ভারী হয়ে ওঠে।

অযোগ্য শিক্ষকের কথা বেশি বলা নিষ্প্রয়োজন। অসাধুতার জন্যে সমাজই বহুলাংশে দায়ী। প্রাথমিক শিক্ষা দিতে হবে সবাইকে, সমাজের এ দাবি সম্পূর্ণ ন্যায়সংগত। সেই প্রাথমিক শিক্ষা প্রায় সবাইকেই মাধ্যমিক শিক্ষার উপযুক্ত করে তুলবে—এ প্রত্যাশাও যুক্তিযুক্ত। কিন্তু মাধ্যমিক শিক্ষা একটু ওপর দিকে গিয়ে, বিশেষ করে উচ্চমাধ্যমিক স্তরে গিয়ে যে আয়োজন, শিক্ষকতার যে মান, শিক্ষার্থীর যে শ্রম এবং মনোযোগ দাবি করে সমাজ এখন পর্যন্ত সে বিষয়ে সম্পূর্ণ অনবহিত। এই অনবধানের ছিদ্রপথে প্রবেশ করেছে "প্রাইভেট টিউশন", যার অপর নাম "পাবলিক ডিসেপশন"। শিক্ষাবিহীন শিক্ষা, না-বুঝে-মুখস্থ-করা বিদ্যা। সাধারণ ছাত্রের পরীক্ষা পাশের জন্যে এই বিদ্যাই এখন সবচেয়ে কার্যকর। এই বিদ্যার প্রকাণ্ড বাঁধা সড়ক দিয়েই অদম্য গতিতে এগিয়ে চলেছে বিপুল ছাত্রধারা। কে তার পথ আটকে দাঁড়াবে?

৮. ৭. ১৯৮৬

ভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়